দেশ কাল মানুষের আজ কাল পরশু

নাগরিক

দ্বিতীয় বর্ষ ❖ ১২শ সংখ্যা ❖ ২ নভেম্বর ২০২৫

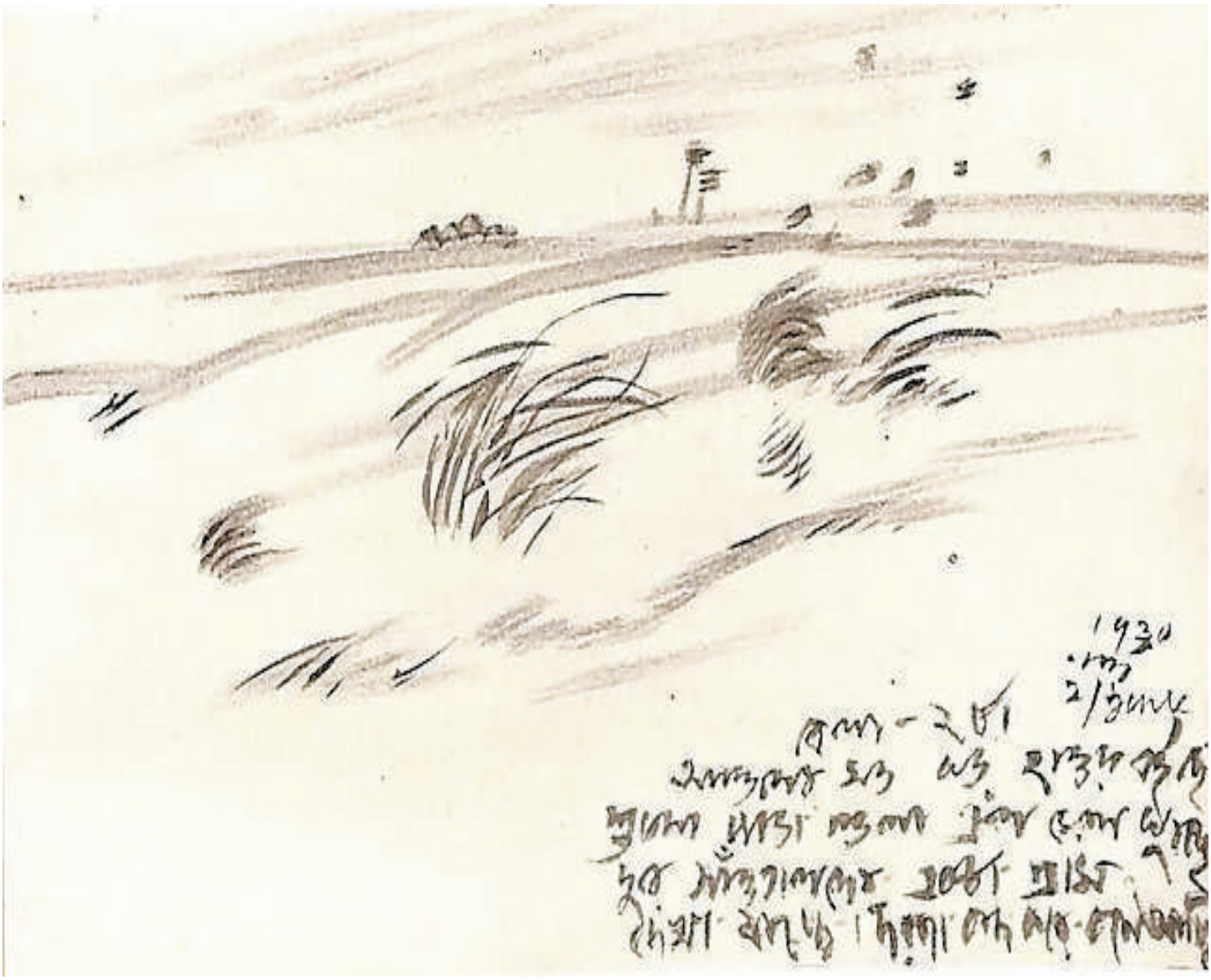

➲এই সংখ্যায় থাকছে

প্রবন্ধ

● নোয়াখালীতে মহাত্মা গান্ধী	ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী মহারাজ	৪
● নজরুলের হিন্দু-মুসলমান	মিলন দত্ত	৭
● বাংলাদেশের গণ-অভ্যুত্থান এবং ভারতবিরোধিতার রাজনীতি	অজিত কুমার রায়	১১
● নভেম্বর বিপ্লবের তোপধ্বনি কাঁপাল নতুন করে, নতুন ভাবে	দিলীপ চক্রবর্তী	২৩

ইতিহাস

● বিনায়ক দামোদর সাভারকর দ্বিজাতিতত্ব ও স্বাধীনতা সংগ্রাম	শান্তনু দত্ত চৌধুরী	২৫

নাগরিক স্মৃতিচারণা

● সর্বাধিনায়ক সতীশ চন্দ্র সামন্ত	মানস ঘোষ	২৯

ভ্রমণ

● ইস্তাম্বুল	সৌর বসু	৩০

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

● শান্তিতে নোবেল পুরস্কার এক প্রহসন	মহম্মদ আমিন	৩৮

পুস্তক পর্যালোচনা

● রাশিয়ায় এক বাঙালি বিপ্লবীর খোঁজে	খলিলউল্লাহ্	৩৯

গল্প

● বড্ড চেনা চেনা	শঙ্কর দেবনাথ	৪২

দেশের খবর

● অসমের ছয় জনগোষ্ঠীর আন্দোলনের হাল হকিকত	কমলেশ গুপ্ত	৪৭
● বিহার বিধানসভা নির্বাচন এস.আই.আর, কাস্ট সমীকরণ ও গণতন্ত্রের দোটানা	সুকুমার মিত্র	৪৯
● পরিযায়ী শ্রমিকদের জীবন-যন্ত্রণা	মজিবুর রহমান	৫০
● আর.এস.এস কে মহিমান্বিত করার অপচেষ্টা	শুভাশিস মজুমদার	৫২
● এক কদম গান্ধী কে সাথ পদযাত্রা		৫৪
● ভারতে সৎ বাঙালি ও দলিত বাঙালির মুক্তির একই পথ	নীতীশ বিশ্বাস	৫৭
● জনসাধারণের টাকায় বন্ধু আদানীদের কোম্পানিতে খয়রাতি মোদী সরকারের	অমিতাভ সিংহ	৫৮

সম্পাদক

শান্তনু দত্ত চৌধুরী

সম্পাদকমন্ডলী

সৌর বসু, মিলন দত্ত, ড. সিদ্ধার্থ সেন, অমিতাভ সিনহা, মনিরুল হক, শুভাশিস মজুমদার।

সৌর বসু কর্তৃক সীমান্ত পল্লী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম, পিন ৭৩১২৩৫ থেকে প্রকাশিত।

● ই মেইল : nagorik0240@gmail.com ●ফোন : 80178 04019 / 94340 22512 ● ওয়েবসাইট : nagorik.co.in

সম্পাদকীয়

অসমে বিজেপির আক্রমণের মুখে 'আমার সোনার বাংলা'

'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি',

কবিগুরুর বীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত এই কালজয়ী গানটি কি আমাদের দেশে গাওয়া অপরাধ বা নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হয়েছে ? এই রকম একটি প্রশ্ন ওঠার কারণ , সংবাদে প্রকাশ গত সোমবার ২৭ অক্টোবর অসমের শ্রীভূমি জেলায় কংগ্রেস সেবাদলের এক সভায় কংগ্রেসের এক প্রবীণ নেতা এই রবীন্দ্রসঙ্গীতটি গাইতেই রাজ্য বিজেপি দলের নেতা মন্ত্রীরা প্রচণ্ড চটেছেন। তাঁদের বক্তব্য সংখ্যালঘু তোষণের জন্য কংগ্রেস তাঁদের সভায় বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত গেয়েছে । এদের মতে অসমের মতন সীমান্তের রাজ্যে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া দেশদ্রোহিতার সামিল। এই ধরণের অভিযোগ সম্পর্কে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি'র সভাপতি গৌরব গগৈ বলেছেন ' দেশের ইতিহাস , পরম্পরা , সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে বিজেপি ও তাদের আইটি সেলের কোনও জ্ঞানই নেই।'

ওইদিনের সভায় শ্রীভূমি জেলার প্রবীণ কংগ্রেস নেতা বিধুভূষণ দাস তাঁর বক্তব্য শুরু করেন 'আমার সোনার বাংলা ' এই গানটি গেয়ে । এই অনুষ্ঠানের সচিত্র সংবাদ সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই বিজেপি দল আক্রমণাত্মক হয়েওঠে। এরপরে আসরে নেমে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেছেন 'কংগ্রেসের ওই সভায় বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার জন্য ওই কংগ্রেস নেতা ও সভায়উপস্থিত সকলের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা দায়ের করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কারণ এই ধরণের কাজ দেশ ও জাতীয় সঙ্গীতের বিরোধী।'যদিও দুই দেশের জাতীয় সঙ্গীতের স্রষ্টাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অসমের আর এক মন্ত্রী অশোক সিঙ্ঘল ওই অনুষ্ঠানটি এক্স হ্যান্ডেল- এ প্রচার করেবলেছেন , ' যে দেশ উত্তর পূর্বাঞ্চলকে ভারত থেকে আলাদা করতে চায় তাদের জাতীয় সঙ্গীত গাইছে কংগ্রেস । এখন প্রমাণ হয়ে গিয়েছে গত কয়েক দশক ধরে কংগ্রেসই অসমে মিয়াঁদের অনুপ্রবেশে উৎসাহ দিয়েছে। পারলে এরা গোটা অসম বাংলাদেশকে দিয়ে দেবে।' বিজেপি নেতারা চরম ব্যক্তিগত আক্রমণ করেবলেছেন গৌরব সস্ত্রীক পাকিস্তানের গুপ্তচর ।

করিমগঞ্জ জেলা কংগ্রেস নেতা শাহাদাত আহমদ চৌধুরী বলেন 'বর্ষীয়ান নেতা বিধুদা রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়েছেন। নিছক রাজনীতি করার জন্য বিজেপি রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়েও কাদা ছোড়াছুড়ি করছে।' গৌরব গগৈ বলেছেন 'এরা মনে করে বাংলাভাষী ও বাঙালি মানেই বাংলাদেশী ।এরা কখনও বাঙালিকে চেনা ও জানার চেষ্টাই করেনি। বিজেপি এখন রবীন্দ্রনাথকে এই নোংরামির মধ্যে টেনে এনে অপমান করছে । পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এদের আসল চেহারা চিনে নেবেন।' কংগ্রেস মনে করে কবি সমগ্র বাংলার মানুষের জন্যই গানটি লেখেন। বহুপরে এটি বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হয়। কংগ্রেস নেতা পবন খেরা জানতে চেয়েছেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কি 'আমার সোনার বাংলা' গানটিকে ভারত বিরোধী বলে ঘোষণা করবেন?

'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটি ১৯০৫ সালের ৭ই আগস্ট কলকাতা টাউন হলে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে আয়োজিত প্রতিবাদ সভা উপলক্ষে রচিত। এটি সঞ্জীবনী পত্রিকায় (২২ ভাদ্র, ১৩১২ সংখ্যা) কবির স্বাক্ষরসহ প্রকাশিত হয়েছিল। কবির বয়স তখন ৪৪ বছর। এটি একটি দেশাত্মবোধক গান। ব্রিটিশ শাসনে বাঙালির ঐক্যে আঘাত হানার জন্য লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গ করেন। এই নির্দেশের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয় । দেশাত্মবোধক গান ছিল এই আন্দোলনের অনুপ্রেরণা। এই গানটি ব্রিটিশ রাজশক্তির ক্রোধের সম্মুখীন হয়।

স্বাধীনতা ও দেশভাগের পর পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। পূর্ববাংলা পরিণত হয় পূর্ব পাকিস্তানে। ওই সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রে রবীন্দ্রনাথের গান অলিখিত ভাবে নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু এই সব কঠোর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথের গান ছড়িয়ে পড়ে। প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক জহির রায়হান তাঁর ' জীবন থেকে নেওয়া 'শীর্ষক ছবিতে' আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি ' এই গানটি সার্থক ভাবে ব্যবহার করেন। পাকিস্তানি সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিস্ট শাসকরা এই ছবিটিকে বে-আইনি ঘোষণা করে ।১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের কণ্ঠে ছিলো অনেক গানের সঙ্গে ' আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।' বাংলাদেশ মুক্ত হবারপর ১৯৭২ সালে এই রবীন্দ্র সঙ্গীতটির প্রথম দশটি চরণ বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতরূপে নির্ধারিত হয়। কিন্তু ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান সাম্প্রদায়িক সামরিক চক্রের দ্বারা নৃশংস ভাবে নিহত হবার পর থেকেই সে দেশের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যা কিছু অর্জিত হয়েছে তাই আক্রান্ত হচ্ছে। বর্তমানে ওই দেশের শাসক ইসলামিক মৌলবাদী শক্তি এই অসাধারণ জাতীয় সঙ্গীতটি পরিবর্তন করার চেষ্টা করছে । কিন্তু ওই দেশের অসাম্প্রদায়িক ,প্রগতিশীল ও ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি এই অপচেষ্টার বিরুদ্ধ ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এখন দেখা যাচ্ছে বিজেপি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ, পাকিস্তানি সাম্প্রদায়িক সামরিকতন্ত্র ও বাংলাদেশের ইসলামিক মৌলবাদী শক্তির মতবাদের অনুসারী ও পরিপূরক। তারা চরম রবীন্দ্র বিরোধী।

প্রবন্ধ

নোয়াখালীতে মহাত্মা গান্ধী

ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী মহারাজ

(শ্রদ্ধেয় বিপ্লবী ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী গুপ্ত বিপ্লবী আন্দোলনের 'মহারাজ' বলে সম্বোধিত হতেন। তিনি অনুশীলন সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ব্রিটিশ শাসনে ৩০ তিরিশ বছর কারাবাস করেছেন। তার ভিতর ৭ সাত বছর বন্দী ছিলেন আন্দামান সেলুলার জেলে। বিপ্লবী আন্দোলনের এই মহারাজ নোয়াখালীতে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে ছিলেন। ১৯৪৬ সালের ১৬ অকটোবর নোয়াখালীতে মুসলিম লীগের প্ররোচনা ও মদতে ভয়ঙ্কর দাঙ্গা শুরু হয়। হিন্দুরা আক্রান্ত হয়। এই সংবাদ শুনে গান্ধিজি নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে নোয়াখালির চৌমুহনীতে এসে পৌঁছন। তিনি বিপন্ন দাঙ্গাপীড়িত মানুষের পাশে এসে দাঁড়ান। তিনি চার মাস নোয়াখালিতে ছিলেন ও গোটা জেলায় খালি পায়ে হেঁটে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে গিয়ে হিন্দুদের মধ্যে সাহস সঞ্চার করেন। সম্প্রীতির মনোভাব ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। এই সময় বিখ্যাত সশস্ত্র বিপ্লববাদী ত্রৈলোক্যনাথচক্রবর্তী নোয়াখালিতে গিয়ে মহাত্মা গান্ধির সঙ্গে যোগদেন। তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'জেলে ত্রিশ বছর ও পাক ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ' গ্রন্থে যা লিখে গিয়েছিলেন তা তুলে দিলাম। পাঠক মহারাজের এই লেখাটি পাঠ করলে বুঝতে পারবেন মহাত্মা গান্ধি কি দুর্জয় সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন ও বিপন্ন মানুষের মনে সাহস ফিরিয়ে এনেছিলেন ।)

১৯৪৬ সনের ১৫ই আগষ্ট কলিকাতার দাঙ্গা হয়। স্বদেশী আন্দোলনের সময়, ১৯০৫-৬ সনে যখন আমরা বিপ্লব দলে যোগদান করি, তখন আমাদের স্বাধীনতার কল্পনায় সাম্প্রদায়িক মনোভাব ছিল না, আমাদের কল্পনায় ছিল দেশ এবং জাতি। দেশের স্বাধীনতা সকলে, সকল সম্প্রদায়ের লোক, সমানভাবে ভোগ করিবে। মুক্তির পর আমাদিগকে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইল। তখন ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি খুব জটিল ছিল। ইতিমধ্যে কু-খ্যাত নোয়াখালী দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে, তাহার প্রতিক্রিয়া বিহারে দেখা গিয়াছে। আমি তখন কলিকাতায় ছিলাম। নোয়াখালী দাঙ্গা বিদ্ধস্ত অঞ্চলে গভর্ণমেন্ট শান্তি স্থাপনের জন্য সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী প্রেরণ করিলেন। আমি বন্ধুদের সহিত পরামর্শ করিয়া নোয়াখালী রওয়ানা হইলাম। দত্তপাড়া দেওয়ানজী বাড়ীতে কেদারেশ্বর গুহ নামে আমাদের দলের একজন সভ্য ছিলেন, আমি দত্তপাড়া পৌঁছিলাম। তখন দাঙ্গা বন্ধ হইয়াছে, লোক চলাচল শুরু হয় নাই। স্থানে স্থানে রিফিউজী ক্যাম্প স্থাপিত হইগছে, ক্যাম্পে সশস্ত্র পুলিশ পাহারা দিতেছে। এমন সময় মহাত্মা গান্ধী সদলবলে দত্তপাড়া উপস্থিত হইলেন।

মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে ছিলেন, তাহার নাতনী মন্নু গান্ধী, নাতবৌ আভা গান্ধী, প্যারেলাল, জীবন সিং, সেক্রেটারী অধ্যাপক নির্মল কুমার বসু , সুচেতা কৃপালনী , শাহ নওয়াজ খান প্রমুখ অসংখ্য ব্যক্তিবর্গ। বাংলার বিপ্লবী নারী ভগিনী গণ যথা লীলা রায় , বিনা দাস , কমলা দাশগুপ্ত , কল্যাণী দাস , অশোকা গুপ্ত (শৈবাল গুপ্ত 'র স্ত্রী), বেলা বসু (নেতাজির ভাইজি) ও তাঁর স্বামী হরিদাস মিত্র প্রমুখ। তাঁহার প্রাণদণ্ডাদেশ হয়। মহাত্মা গান্ধী তাঁহাকে রক্ষা করেন। বিভিন্ন সংবাদপত্রের দেশী ও বিদেশী প্রতিনিধিগণ। মহাত্মা গান্ধীর দেহরক্ষার জন্য গভর্নমেন্ট ২৫ জন বন্দুকধারী সিপাহী এবং হাবিলদার প্রভৃতি পাঠায় । গান্ধিজি কোনও দেহরক্ষী চাননি। পুলিসের গুপ্ত বিভাগের লোকও কিছু ছিল। সমগ্র ভারত এবং পৃথিবীর বৃহৎ রাষ্ট্র সমূহের নজর নোয়াখালীর উপর পড়িল। মহাত্মা গান্ধী দত্তপাড়াতে কয়েক দিন অবস্থানের পর ঘোষণা করিলেন, তিনি প্রত্যেক দিন পদব্রজে একটি করিয়া দাঙ্গা বিধ্বস্ত গ্রামে যাইবেন এবং এক রাত্রি বাস করিবেন । শান্তি স্থাপন না হওয়া পর্যন্ত তিনি এইরূপ ভাবে দাঙ্গা বিধ্বস্ত অঞ্চলে ঘুরিতে থাকিবেন এবং এভাবে তিনি মৃত্যু বরণ করিবেন। তিনি রাজনৈতিক প্রতিভার পরিচয় দিলেন। ৭৮ বৎসর বয়সে, এই শীতকালে তিনি খালি গায়, খালি পায় প্রত্যহ প্রাতে এক গ্রাম হইতে অপর গ্রামে যাইতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন , যে মাটিতে এতো মানুষের রক্তপাত হইয়াছে তিনি সেই মাটিতে চটিজুতা পড়িয়া হাঁটিবেন না।

মহাত্মা গান্ধীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় কংগ্রেস, কমিউনিস্ট পার্টি, বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল (R. S. P.), রামকৃষ্ণ মিশন, হিন্দু মহাসভা এবং আরো বহু দল দাঙ্গা বিধ্বস্ত অঞ্চলে সাহায্য দানের জন্য বিভিন্ন স্থানে সাহায্য কেন্দ্র স্থাপন করিলেন। মহাত্মার শান্তি যাত্রায় সবাই যোগ দিলেন। মহাত্মা গান্ধীর শিষ্য সতিশ চন্দ্র দাসগুপ্তের প্রধান কেন্দ্র ছিল কাজির খিল, নাম 'গান্ধি ক্যাম্প'।

জাতীয় কংগ্রেসের প্রধান কেন্দ্র ছিল চৌমুহনী, সেক্রেটারী ছিলেন হারাণ চন্দ্র ঘোষ চৌধুরী। আমার প্রধান কেন্দ্র ছিল জয়াগ। জয়াগ জমিদার বাড়ীতে একটি রিফিউজি ক্যাম্প ছিল। এই গ্রামের প্রতুল চৌধুরী

আমাদের দলের সভ্য ছিলেন। বিভিন্ন দাঙ্গা বিধ্বস্ত অঞ্চলে রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্র ছিল।

[মহাত্মা গান্ধী যখন এক গ্রাম হইতে অপর গ্রামে রওয়ানা হইতেন, তাহার সঙ্গে প্রায় দুইশত লোকের শোভা যাত্রা চলিত। মহাত্মা গান্ধী ও তাহার সহচরগণ ব্যতীত সঙ্গে থাকিতেন বিভিন্ন দেশের সংবাদ পত্রের প্রতিনিধিগণ, ২৫ জন বন্দুকধারী সিপাহী, হাবিলদার, পুলিশ অফিসার, ভলান্টিয়ার ও দর্শক বৃন্দ। থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা প্রত্যেকের নিজের। মহাত্মা গান্ধী যখন এক গ্রাম হইতে অপর গ্রামে পৌঁছিতেন, তখন সেই গ্রামের সংখ্যালঘুরা মনে করিতেন, 'ভগবান আমাদের মুক্তির জন্য ত্রাণকর্ত্তা পাঠাইয়াছেন,' দুষ্কৃতকারীরা পুলিশ ও বন্দুকধারী সিপাহী দেখিয়া ভয়ে গ্রাম ছাড়িয়া পলাইতে লাগিল। প্রত্যহ বৈকালে উভয় সম্প্রদায়ের লোক লইয়া প্রার্থনা সভা হইত এবং প্রার্থনার পর মহাত্মা গান্ধী উপদেশ দিতেন। সুফল ফলিতে লাগিল, অবস্থার উন্নতি হইতে লাগিল।'

মহাত্মা গান্ধী যখন আমার কেন্দ্রে উপস্থিত হইলেন, তখন আমি সেই দেশী কীর্ত্তনের ব্যবস্থা করিলাম । মহাত্মার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে একদল মেয়ে লোক খোল করতাল বাজাইয়া নৃত্য করিতে করিতে কীর্তন গাইতে লাগিল, মহাত্মা দশ মিনিট দাড়াইয়া শুনিলেন।

মহাত্মা গান্ধী যখন নোয়াখালী ছিলেন, তখন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, সর্দ্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতের প্রধান প্রধান নেতারা মাঝে মাঝে দাঙ্গা বিধ্বস্ত অঞ্চলে যাইয়া মহাত্মা গান্ধীর সহিত দেখা করিয়াছেন। বাংলা দেশ হইতেও শরৎ চন্দ্র বসু, ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়, ড. প্রফুল্ল ঘোষ , ডা. সুরেশ ব্যানার্জী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ মাঝে মাঝে দাঙ্গা বিধ্বস্ত অঞ্চলে গিয়াছেন। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিও মহাত্মার সহিত দেখা করিয়া যান। বাংলার প্রধান মন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দ্দী সাহেবও দত্তপাড়া যাইয়া মহাত্মা গান্ধীর সহিত দেখা করিয়াছেন। আমি তখন দত্তপাড়া উপস্থিত ছিলাম।

কিছুদিন পর মহাত্মা গান্ধী তাহার সঙ্গীদিগকে নির্দেশ দিলেন, সকলে একত্র

সেই গ্রামের সংখ্যালঘুরা
মনে করিতেন,
'ভগবান আমাদের মুক্তির জন্য
ত্রাণকর্ত্তা পাঠাইয়াছেন,'
দুষ্কৃতকারীরা পুলিশ ও বন্দুকধারী
সিপাহী দেখিয়া ভয়ে গ্রাম
ছাড়িয়া পলাইতে লাগিল।
প্রত্যহ বৈকালে উভয় সম্প্রদায়ের
লোক লইয়া প্রার্থনা সভা
হইত এবং প্রার্থনার পর
মহাত্মা গান্ধী উপদেশ দিতেন।
সুফল ফলিতে লাগিল, অবস্থার
উন্নতি হইতে লাগিল।'

থাকিতে পারিবে না, প্রত্যেকে এক একটি খালি গ্রামে, পোড়া বাড়ীতে, নারিকেল পাতা দিয়া ঘর উঠাইয়া একা থাকিবে। তিনি প্রথম নির্দেশ দিলেন, তাহার ১৮ বৎসর বয়স্ক নাতনি মন্নু গান্ধীর উপর। মহাত্মার এই নির্দেশের জন্য সকলেই চিন্তিত,ভীত কিন্তু মহাত্মা গান্ধী অচল অটল। মন্নু গান্ধী একখানা গ্রামে,পোড়া বাড়ীতে, নারিকেল পাতার ঘরে রাত্রে একা কাটাইতে লাগিলেন। অন্যান্য সকলেও সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিলেন, প্রত্যেকে এক এক গ্রামে যাইয়া বসিলেন। লোকের মনে সাহস সঞ্চার হইল, যাহারা ভয়ে গ্রাম ছাড়িয়া পালাইয়া গিয়াছিল, আস্তে আস্তে তাহারা আবার নিজ নিজ গ্রামে ফিরিয়া আসিল।

সুচেতা কৃপালনী , জীবন সিং , প্যারেলাল প্রমুখ বিভিন্ন গ্রামে বসিয়া গঠনমূলক কাজ করিতে লাগিলেন। কাজের মধ্যে ছিল সাম্প্রদায়িক ঐক্য স্থাপন ও চরকা প্রচলন। জয়াগ জমিদার বাড়ীর অপর হিস্যার মালিক ছিলেন হেমন্ত কুমার ঘোষ, ব্যারিষ্টার, তিনি লক্ষ্ণৌ থাকিতেন, তাঁহার পুত্র ছিল না, দুই কণ্যা ছিল, তিনি দেশে আসিতেন না । তাঁহার ভগ্নিপতি সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতেন। হেমন্ত বাবুর ভাগিনেয়গণ আমাদের দলভুক্ত ছিল। আমার কেন্দ্র হেমন্তবাবুর বাড়ীতে ছিল। জয়াগ রিফিউজি ক্যাম্পে আমকী গ্রামের যশোদা কুমার দে, কবিরাজ সপরিবারে ছিলেন। যশোদা বাবুর স্ত্রী আমাকে ধর্মের বাপ ডাকিলেন এবং যশোদা বাবু প্রস্তাব করিলেন, তিনি আমার খাওয়ার ব্যবস্থা করিবেন। হেমন্ত বাবু মহাত্মা গান্ধীর নিকট প্রস্তাব করিলেন, তাহার সম্পত্তি গঠন মূলক কাজের জন্য মহাত্মা গান্ধীকে দান করিবেন ।মহাত্মা গান্ধী এই প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। ইহার পর হেমন্ত বাবুর ভগ্নিপতি এবং ভাগিনেয়গণ প্রস্তাব করিলেন আমি যেন এই সম্পত্তি গ্রহণ করি। আমি এই প্রস্তাবে রাজী হইলাম না, কারণ আমার ইচ্ছা ছিল নিজ গ্রামে বসিয়া গঠনমূলক কাজ করিব । ইহার পর সতীশ চন্দ্র দাস গুপ্ত হেমন্ত বাবুর সহিত ব্যবস্থা করিয়া এই সম্পত্তি নিজ নামে লেখাইয়া লন। আমার জয়াগ ত্যাগ করার পর সতীশবাবু তাহার কেন্দ্র কাজির খিল হইতে জয়াগ গ্রামে স্থানান্তরিত করেন ।

দাঙ্গার পর বিধ্বস্ত অঞ্চলে কোন স্কুল ছিল না, ডাক্তার ছিল না, ডিস্পেন্সারি ছিল না। আমার ৪টি কেন্দ্র ছিল, আমি প্রত্যেক কেন্দ্রে স্কুল এবং হোমিও-প্যাথী ডিস্পেন্সারী স্থাপন করিলাম। আমি জয়াগ কেন্দ্রে একটি প্রাইমারী স্কুল স্থাপন করিলাম এবং উক্ত গ্রামের অর্পণা ঘোষকে মাসিক দশ টাকা বেতনে শিক্ষক

নিযুক্ত করিলাম। আমি ছাত্র ছাত্রীদের বই শ্লেট পেন্সিলের ব্যবস্থা করিলাম। আমি জয়াগ গ্রামে একটি হোমিওপ্যাথি ডিস্পেন্সারি স্থাপন করিলাম, দাতা মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্যের পুত্র হেরম্ব ভট্টাচার্যের নিকট হইতে আমার কেন্দ্র সমূহের জন্য ঔষধের ব্যবস্থা করিলাম। জয়াগ কেন্দ্রে ডাক্তার নিযুক্ত হইল, আমাদেরই দলের সভ্য ডাঃকৃষ্ণচন্দ্র সাহা। আমকী কেন্দ্রে যশোদা কুমারদেকবিরাজেরবাড়ীতে আমার গ্রামের পরিমল রায়কে শিক্ষক, ডাক্তার এবং কর্মী হিসাবে বসাইলাম। আমার গ্রামের রাজেন্দ্র কুমার চক্রবর্তীকে এক গ্রামে বসাইলাম। কাজ চলিতে লাগিল, সুফল ফলিতে লাগিল। কাজের মধ্যে বড় কাজ ছিল, সাম্প্রদায়িক ঐক্য স্থাপন, খাদী ও চরকা প্রচলন। আমি বিধ্বস্ত অঞ্চলে প্রায় প্রত্যেক গ্রামে গিয়াছি, হাইমচড় গিয়াছি, দালাল বাজার গিয়াছি, প্রায় হাটিয়াই সব গ্রামে যাইতে হইয়াছে। সভীশ বাবু তাহার কাজিরখিল কেন্দ্রে বাঁশের চরকা তৈয়ার করার ব্যবস্থা করিলেন। পূর্ব্ব পাকিস্তানে বাঁশের অভাব নাই, কাঠের চরকা অপেক্ষা বাঁশের চরকায় খরচ খুব কম পড়ে। আমি পরিমল এবং রাজেন্দ্রকে কাজিরখিল পাঠাইয়া বাঁশের চরকা তৈয়ার করা শিখাইলাম, উদ্দেশ্য আমার গ্রামে বাঁশের চরকা তৈয়ার কেন্দ্র স্থাপন করিব।

আমি নোয়াখালিতে প্রায় দেড় বৎসর ছিলাম। দেশ বিভাগ যখন হয় তখন আমি দাঙ্গা বিধ্বস্ত অঞ্চলে ছিলাম। ঐ সময় পাক ভারতের পরিস্থিতি অত্যন্ত উত্তেজনা পূর্ণ ছিল। দেশ ত্যাগের হিড়িক চলিতে লাগিল, রাজনৈতিক নেতা এবং কর্মীরা প্রায় সকলেই চলিয়া গেলেন। আমি স্থির করিলাম, আমি দেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব না, আমি পাকিস্তানেই থাকিব ; পাকিস্তানের জনগণের সুখ দুঃখের অংশ গ্রহণ করিয়াই থাকিব। এই দেশ, পূর্ব্ব বঙ্গ, আমার দেশ; আমার পিতৃ পিতামহের স্মৃতি জড়িত দেশ, আমি এই দেশ কেন ত্যাগ করিয়া যাইব ? আমাদের ব্যক্তিগত ভাবে চিন্তা করিলে চলিবে না; সমষ্টিগত ভাবে চিন্তা করিতে হইবে।

দেশ ত্যাগ, সমস্যার সমাধান নয়, দেশে থাকিয়াই সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। আমি যদি দেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাই, তবে আমি যাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলাম, তাহাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হইবে। আমি দেখিলাম সাম্প্রদায়িক সমস্যা জটিল আকার ধারণ করিয়াছে, সংখ্যালঘুদের মনোবল ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, এরূপ অবস্থায় আমার দেশত্যাগ চলিবে না, আমার এই দেশেই থাকিতে হইবে, আমি এই দেশে থাকিয়াই দেশের জনগণের সেবা করিব।

দেশ ত্যাগ, সমস্যার সমাধান নয়, দেশে থাকিয়াই সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। আমি যদি দেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাই, তবে আমি যাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলাম, তাহাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হইবে। আমি দেখিলাম সাম্প্রদায়িক সমস্যা জটিল আকার ধারণ করিয়াছে, সংখ্যালঘুদের মনোবল ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, এরূপ অবস্থায় আমার দেশত্যাগ চলিবে না, আমার এই দেশেই থাকিতে হইবে, আমি এই দেশে থাকিয়াই দেশের জনগণের সেবা করিব। আমি স্থির করিলাম আমি আমার গ্রামে থাকিয়া গঠন মূলক কাজ করিব, আমার গ্রামকে একটি আদর্শ গ্রামে পরিণত করিব। আমি গান্ধী ক্যাম্পের সহিত সহযোগিতায় কাজ করিতাম । একদিন আমি সতীশ দাসগুপ্ত মহাশয়কে বলিলাম, নোয়াখালীর অবস্থা এখন স্বাভাবিক হইয়াছে, এখন এখানে আপনার এবং আমার দুইজনের থাকার কোন প্রয়োজন নাই, আমার প্রতিষ্ঠানগুলি আপনার হাতে দিয়া, আমি নিজ গ্রামে গিয়া গঠন মূলক কাজ করিব । আমি একদিন আমার ৪ কেন্দ্রের কর্ম্মীদিগকে সতীশ বাবুর নিকট ডাকাইয়া পরিচয় করাইয়া দিলাম, তাহার মধ্যে আমকীর যশোদা বাবুও ছিলেন। আমার জয়াগ কেন্দ্রের তহবিলে ৮০ টাকা ছিল, অন্যান্য কেন্দ্রেও কিছু টাকা ছিল, আমি সব টাকা এবং কর্ম্মীদিগকে সতীশ বাবুর হাতে দিয়া মুক্ত হইলাম। আমি পরিমল এবং রাজেন্দ্রকে বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলাম।

মহাত্মা গান্ধী যখন নিহত হন, তখন আমি জয়াগ ছিলাম। মৃত্যু সংবাদ পাইয়া আমি তৎক্ষনাৎ কাজির খিল রওয়ানা হইলাম, ১২/১৪ মাইল রাস্তা হাঁটিয়া গেলাম। সেখানে হিন্দু মুসলমান, বহু লোক সমবেত হইয়াছে, কাহারো মুখে শব্দ নাই, সকলেরই চোখ দিয়া জল পড়িতেছে, কি করুণ দৃশ্য ! ❐

নজরুলের হিন্দু-মুসলমান

মিলন দত্ত

'দেখিলাম, আল্লার মসজিদ আল্লা আসিয়া রক্ষা করিলেন না, মা-কালীর মন্দির কালী আসিয়া আগলাইলেন না! মন্দিরের চূড়া ভাঙিল, মসজিদের গম্বুজ টুটিল! আল্লার এবং কালীর কোনো সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। আকাশ হইতে বজ্রাঘাত হইল না মুসলমানদের শিরে, 'আবাবিলের' প্রস্তর-বৃষ্টি হইল না হিন্দুদের মাথার উপর। এই গোলমালের মধ্যে কতকগুলি হিন্দু ছেলে আসিয়া গোঁফ-দাড়ি-কামানো দাঙ্গায় হত খায়রু মিয়াঁকে হিন্দু মনে করিয়া 'বলো হরি হরিবোল' বলিয়া শ্মশানে পুড়াইতে লইয়া গেল, এবং কতকগুলি মুসলমান ছেলে গুলি খাইয়া হত দাড়িওয়ালা সদানন্দ বাবুকে মুসলমান ভাবিয়া 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' পড়িতে পড়িতে কবর দিতে লইয়া গেল। মন্দির এবং মসজিদ চিড় খাইয়া উঠিল, মনে হইল যেন উহারা পরস্পরের দিকে চাহিয়া হাসিতেছে!' (মন্দির ও মসজিদ)

১৯২৫ এবং ১৯২৬ সাল জুড়ে কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলেছিল। এই দাঙ্গার নারকীয়তা নজরুলের হৃদয়কে ব্যথিত রক্তাক্ত করেছিলঞ্চসেই ঘটনাগুলোর প্রতিক্রিয়ায় ২৬ অগস্টের 'গণবাণী' পত্রিকায় 'মন্দির ও মসজিদ' প্রবন্ধটি লিখেছিলেন। ওই দাঙ্গার পরও দেশ বহু দাঙ্গা দেখেছে। আজও দেখছে প্রায় প্রতিদিন। দাঙ্গায় মরে সাধারণ মানুষ। তারা শুধু হিন্দু নয়, শুধু মুসলমান নয়।

একই বৃন্তে হিন্দু-মুসলমান দুটি কুসুম ফোটানোর আকাঙ্ক্ষায় নজরুল ১৯২৪ সালে জাত তাঁর প্রথম পুত্রসন্তানের নামকরণ করেছিলেন কৃষ্ণ-মহম্মদ, কিন্তু সে সন্তান কয়েক মাস মাত্র বেঁচেছিল। খিলাফত আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ভারত জুড়ে হিন্দু-মুসলমানের হৃদ্যতার যে বন্যা এসেছিল সেটাও বছর চারেকের বেশি টেকেনি। কেরলের মোমালা অর্থাৎ মালাবার অঞ্চলের মুসলমানদের হাতে নামবুদুরি ব্রাহ্মণদের নিগ্রহ ও মালাবার জমিদারদের হত্যা ও জোর করে ধর্মান্তর এবং ভারতের আরও কয়েকটিশহরে বিক্ষিপ্তভাবে ঘটে যাওয়া হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার পরিণামে ১৯২৫ সালের ৩ জুলাই কলকাতায় দাঙ্গা শুরু হয়ে যায় গোহত্যা উপলক্ষ করে। কিছুকালে বাদে আর্য সমাজিদের উপর মুসলমানদের হামলা থেকে কলকাতায় যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ১৯২৬ সালে শুরু হয়ে তা চলেছিল তিন দফায়; ২ থেকে ১৫ এপ্রিল, ২২ এপ্রিল থেকে ৮ মে এবং ১১ থেকে ২৫ জুলাই। নজরুল সেই সময় কৃষ্ণনগরের বাসিন্দা। তাঁর 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' গানটি উচিত হয় ওই প্রেক্ষাপটেই। গানটি কংগ্রেসের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের উদ্বোধন সঙ্গীত হিসেবে গাওয়া হয়। কবি স্বয়ং গানটি গেয়েছিলেন।

'গণবাণী' পত্রিকায় 'মন্দির ও মসজিদ' প্রবন্ধটি প্রকাশের এক সপ্তাহ পরে ওই পত্রিকাতেই (২ সেপ্টেম্বর) প্রকাশিত 'হিন্দু-মুসলমান' নামে আরেকটি প্রবন্ধে নজরুল আবারও লেখেন, 'হিন্দুত্ব মুসলমানত্ব দুই সওয়া যায়, কিন্তু তাদের টিকিত্ব দাড়িত্ব অসহ্য, কেননা ওই দুটোই মারামারি বাধায়। টিকিত্ব হিন্দুত্ব নয়, ওটা হয়তো পণ্ডিত্ব! তেমনই দাড়িও ইসলামত্ব নয়, ওটা মোল্লাত্ব! এই দুই 'ত্ব' মার্কা চুলের গোছা নিয়েই আজ এত চুলোচুলি! আজ যে মারামারিটা বেধেছে, সেটাও এই পণ্ডিত-মোল্লায় মারামারি, হিন্দু-মুসলমানে মারামারি নয়। নারায়ণের গদা আর আল্লার তলোয়ারে কোনো দিনই ঠোকাঠুকি বাধবে না, কারণ তাঁরা দুইজনেই এক, তাঁর এক হাতের অস্ত্র তাঁরই আর এক হাতের ওপর পড়বে না। তিনি সর্বনাম, সকল নাম গিয়ে মিশেছে ওঁর মধ্যে। এত মারামারির মধ্যে এইটুকুই ভরসার কথা যে, আল্লা ওরফে নারায়ণ হিন্দুও নন, মুসলমানও নন। তাঁর টিকিও নেই, দাড়িও নেই। একেবারে 'ক্লিন'। টিকি-দাড়ির ওপর আমার এত আক্রোশ এই জন্য যে, এরা সর্বদা স্মরণ করিয়ে দেয় মানুষকে যে তুই আলাদা আমি আলাদা। মানুষকে তার চিরন্তন রক্তের সম্পর্ক ভুলিয়ে দেয় এই বাইরের চিহ্নগুলো।' প্রবন্ধদুটি কবির 'রুদ্রমঙ্গল' প্রবন্ধ সঙ্কলনে অম্তর্ভক্ত।

ভারতের মুসলিম ঐতিহ্যকে নিজের বলে ভাবতে অসুবিধে ছিল হিন্দুদের, তেমনি মুসলমানরাও হিন্দু সংস্কৃতিকে বেগানা সংস্কৃতি বলে দুরে রেখেছে। এমন একটা বিদ্বেষ ভরা সমাজে নজরুল এসেছিলেন মিলনের সুস্থ বাতাস বইয়ে দিতে। আল্লা -ভগবান, মসজিদ-মন্দির-গির্জা-ঈসা-মুসা, কৃষ্ণ, বুদ্ধ-মুহম্মদ প্রভৃতি আপাতভাবে পরস্পর বিরোধী এবং সংঘাতময় শধগুলোকে তিনি সমান মাত্রায় ব্যবহার করে বাঙালি পাঠকের মানসিক সংকীর্ণতা দূর করেছেন। সাহিত্যে আরবি ফারসি শধ প্রয়োগে হিন্দুদের অনীহা ক্রমেই বাড়ছিল, নজরুল পুনরায় তা দক্ষতার সঙ্গে দূর করার চেষ্টা করেছেন। বৃটিশ আসার আগে তো বটেই, এমন কি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রথম দিকের সংস্কৃত ও

বাংলা পন্ডিতদের গদ্য রচনাতেও আরবি ফারসি শব্দের যথেষ্ট ব্যবহার দোখে গেছে। রামরাম বসু লিখিত 'প্রতাপাদিত্য চরিত'- এও ফারসি শব্দের যথাযথ প্রয়োগ রয়েছে। অর্থাৎ বাংলা শব্দে শুচিবায়ুগ্রস্ততা, মুসলমানি শব্দ-শুদ্ধিকরণ অভিযান ইত্যাদি; সবই ঘটেছিল ইংরেজের বিভক্তি নীতির কারণে।

নজরুল মুসলমানের সংকীর্ণতাকে আঘাতের পাশাপাশি হিন্দু ধর্মের বর্ণবৈষম্য ছোঁয়াছুয়ির বিষয়টাকেও তীব্রভাবে কটাক্ষ করেছেন। 'জাতের নামে বজ্জাতি' গান সম্বন্ধে ডক্টর নলিনাক্ষ সান্যাল বলেছেন, '১৩৩১ সালের ৩ বৈশাখ তারিখে বহরমপুরে তার বিয়ে হয়েছিল। কবির সাহিত্য ও সঙ্গীতের বন্ধু উমাপাদ ভট্টাচার্য্য কাকার বাড়ি ছিল ডক্টর সান্যালের শ্বশুর বাড়ি। পরিবেশটি ছিল গোঁড়া হিন্দুয়ানির। সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে এ বাড়ির নিমন্ত্রণে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থকেও আলাদা আলাদা পঙক্তিতে খেতে বসতে হত। মুসলমানদের তো তার ত্রিসীমায়ও ঢোকার উপায় ছিল না। শ্বশুর বাড়ির সঙ্গে ডক্টর সান্যালের শর্ত ছিল, জাতিভেদ মেনে তাঁর নিমন্ত্রিতদের অপমান করা চলবে না। এমনিতে সঙ্গীত চর্চার জন্য নজরুল ইসলাম উমাপদ ভট্টাচার্যের বাড়িতে যেতেন। কিন্তু সে দিন নজরুল পবিত্র কুমার গঙ্গোপাধ্যায়কে নিয়ে ডক্টর সান্যালের বিবাহ আসরে উপস্থিত হলেন। কয়েদী নজরুলের বহরমপুর জেলের সুপারিনটেন্ডেন্ট ও মুর্শিদাবাদের সিভিল সার্জন পৈতাধারী কায়স্থ নেতা ডাক্তার বসন্ত কুমার ভৌমিকও এই আসরে উপস্থিত ছিলেন। বরযাত্রীরা সমবেত নিমন্ত্রিতদের সঙ্গে বসতে যাচ্ছেন দেখতে পেয়ে গোঁড়া হিন্দুর দল উঠে চলে গেলেন। তখন নজরুল ইসলাম উমাপদ ভট্টাচার্যের বাড়িতে গিয়ে বেশ কিছুক্ষণ কাটিয়ে আসরে ফিরে এলেন। সঙ্গে 'জাতের বজ্জাতি' গানটি। তিনি সমবেত বরযাত্রীদের মাঝে গানটি গাইলেন।'

জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত-জালিয়াৎ খেলছে জুয়া

ছুঁলেই তোর জাত যাবে? জাত ছেলের হাতের নয় মোয়া।।

হুঁকোর জল আর ভাতের হাঁড়ি, ভাবলি এতেই জাতির জান,

তাই ত বেকুব, করলি তোর এক জাতিকে এক শ'খান।'

নজরুলই সম্ভবত বাংলা সাহিত্যে প্রথম প্রকৃত এবং সার্থক বাঙালি লেখক যিনি হিন্দু আর মুসলমানকে সমানভাবে জানতেন বুঝতেন। তাঁর লেখায় তাই হিন্দুর ধর্ম-সমাজ-সংস্কার- পুরান কথা ইত্যাদি যে সহজতার সঙ্গে পাই, মুসলমান ধর্ম-সমাজ-সংস্কার-পুরান কথা ততটাই সহজ করে পাই। কোনটাই তাঁর কাছে কষ্টকল্পিত নয়। উভয় ধর্ম সম্প্রদায়ের সমাজ জীবন ও ধর্ম তাঁর গদ্যে কবিতায় গানে এসেছে প্রাত্যহিক যাপনের মতো সহজ করে। নজরুল ছিলেন আদ্যান্ত অসাম্প্রদায়িক। তিনি মানুষের মুক্তির জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন। তার জন্য কবিতা আর সংগ্রাম একই অর্থবোধক। হিন্দু বা মুসলমান তিনি আলাদা করে বুঝতেন না। তিনি বুঝতেন, এদেশ স্বাধীন হবে, মানুষের মধ্যে বৈষম্য দূর যাবে। নজরুল 'হিন্দু-মুসলিম' কবিতায় লিখলেন 'মাভৈঃ। এতদিনে বুঝি জাগিল ভারতে প্রাণ, সজীব হইয়া উঠিয়াছে আজ শ্মশান-গোরস্থান। খালেদ আবার ধরিয়াছে অসি, 'অর্জুন' ছোড়ে বাণ। জেগেছে ভারত, ধরিয়াছে লাঠি হিন্দু-মুসলমান!'

ধর্মীয় জিগির তোলা মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে এবং হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার মোকাবিলায় ১৯৩২ সালের নভেম্বর মাসে সিরাজগঞ্জের (অধুনা বাংলাদেশ) বঙ্গীয় মুসলিম তরুণ সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন, 'মৌলানা মৌলবী সাহেবকে সওয়া যায়, মোল্লাও চক্ষুকর্ণ বুজিয়া সহিতে পারি, কিন্তু কাঠ- মোল্লার অত্যাচার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে।... ইহাদের ফতুয়া-ভরা ফতোয়া। বিবি তালাক ও কুফরীর ফতোয়া 'ইহাদের জাম্বিল হাতড়াইলে দুই দশ গণ্ডা পাওয়া যাইবে। এই ফতুয়াধারী ফতোয়াবাজদের হাত হইতে গরীবদের বাঁচাইতে যদি কেহ পারে ''সে তরুণ। ইহাদের হাতের 'আষা' বা যষ্ঠি মাঝে মাঝে আজদাহা রূপ পরিগ্রহ করিয়া তরুণ মুসলিমদের গ্রাস করিতে আসিবে সত্য, কিন্তু এই 'আষা' দেখিয়ে নিরাশ হইয়া ফিরিলে চলিবে না ...আমাদের পথে মোল্লারা যদি হল বিন্ধ্যাচল, তাহা হইলে অবরোধ প্রথা হইতেছে হিমাচল। ...আমাদের বাংলা দেশের স্বল্পশিক্ষিত মুসলমানদের যে অবরোধ তাহাকে অবরোধ বলিলে অন্যায় হইবে, তাহাকে একেবারে শ্বাসরোধ বলা যাইতে পারে।'

গোলাম মুরশিদ তাঁর 'নজরুলের ধর্মমত ও অসাম্প্রদায়িকতা' প্রবন্ধে ('মেলালেন, তিনি মেলালেন' নামে দৈনিক স্টেটসম্যান, নজরুল জয়ন্তী, ২০০৫ সংখ্যায় প্রকাশিত) বলেছেন, 'আরও একটি জিনিশ বিশেষ করে লক্ষ্য করার মতো; তিনিই প্রথম হিন্দু এবং মুসলিম ঐতিহ্যের অসামান্য মিলন ঘটিয়েছিলেন। কবিতার একই চরণে তিনি দেবতা এবং ফেরেশতা, অবতার এবং পয়গম্বরের কথা বলতে পারতেন। তিনিই বাংলা সাহিত্যের একমাত্র কবি, যিনি একই সঙ্গে হিন্দু এবং মুসলমানী ধর্মীয় সঙ্গীত রচনা করেছেন। কেবল তাই নয়, একই সঙ্গে রচনা করেছেন কীর্তন এবং শ্যামাসঙ্গীত। তার

শ্যামাসঙ্গীতে তিনি আবার শ্যামামায়ের সঙ্গে মিলন ঘটাতে পেরেছেন শ্যামের। তাঁর ভক্তির দৃষ্টিতে সব ধর্ম, সব বর্ণ একাকার হয়ে গেছে। কেউ কেউ বলেন, নজরুলের সাহিত্যে বৈদগ্ধ্যের অভাব ছিলো। তাঁর নিজের ভাষায় 'সেই চিরকেলে বাণী' ছিলো না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর আগে অথবা পরে কেউই সব্যসাচীর মতো হিন্দু-মুসলিম ঐহিত্যের এমন সমন্বয় ঘটাতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথও নন। সাহিত্যের মান বিচার করলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের কোনো তুলনা চলে না, কিন্তু ঐহিত্য সমন্বয়ের প্রশ্ন উঠলে স্বীকার করতেই হবে যে, নজরুল যেমন করে হিন্দু-মুসলিম ঐহিত্যের সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তা আদৌ করতে পারেননি। করার চেষ্টাও করেননি। বস্তুত, বাড়ির কাছের পড়শিদের প্রাঙ্গণের ধারে গেলেও তিনি তাদের বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করেননি। অপর পক্ষে, নজরুল তা কেবল করেননি, সার্থকভাবে করেছিলেন। তিনি যেভাবে তৎসম-তদ্ভব শব্দের সঙ্গে আরবি-ফারসি শধের মিলন ঘটিয়েছিলেন, তাও একমাত্র তারই রচনায় দেখা যায়। এবং তিনি এটা করেছিলেন, আধুনিক বাংলা ভাষার জন্মদাতা এবং পালক রবীন্দ্রনাথ যখন 'খুন' শব্দের ব্যবহারে বিরক্ত হয়েছেন, সেই প্রতিকূল সময়ে।'

শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ সম্প্রদায়ের মুখপত্র হিসেবে ১৬ ডিসেম্বর ১৯২৫ সালে প্রকাশিত হয় 'লাঙল' পত্রিকা। সম্পাদক ছিলেন শ্রীমণিভূষণ মুখোপাধ্যায়। কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন প্রধান পরিচালক। সম্পাদক হিসেবে মণিভূষণবাবুর নাম থাকলেও, সব কাজই করতেন নজরুল।

১৯২৫ সালে কলকাতায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা শুরু হয়। ২০শে চৈত্র, ১৩৩২ তারিখে প্রকাশিত চতুর্দশ সংখ্যায় 'কলিকাতায় দাঙ্গা' শিরোনামে একটি খবর প্রকাশিত হয়। খবরের এক জায়গায় লেখা হয়, 'এবারকার দাঙ্গার একটা বৈশিষ্ট্য এই হয়েছে যে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই পরস্পরের মন্দির ও মসজিদ কোথাও ধ্বংস করেছে এবং কোথাও বা ধ্বংস করার চেষ্টা করেছে। জাকারিয়া স্ট্রীটে যে মন্দিরটি ছিল সেটি মুসলমানরা নষ্ট করে দিয়েছে। আরও অন্যান্য অনেক মন্দির তারা আক্রমণ করতে চেষ্টা করে ব্যর্থ মনোরথ হয়েছে। হিন্দুরা কয়েকটি মসজিদে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। হাওড়া পুলের নিকটবর্ত্তী জুম্মাশার দরগা ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। বানারসী ঘোষ স্ট্রীট অঞ্চলেও একটি দরগা ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে।' ওই দাঙ্গারই সূত্র ধরে লাঙলের পরের সংখ্যায় মুজফফর আহ্মদ লেখেন 'ধর্ম্ম ও রাষ্ট্র' নামে একটি প্রবন্ধ; সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর লেখেন 'ধর্ম্ম রক্ষায় হিন্দু- মুসলমান'। 'বিবাদ' নামে মুজফফর আহ্মদ দাঙ্গার ভয়াবহতা নিয়ে লিখেছেন আরও একটিলেখা। সম্পাদকের দফতর থেকে লেখা হয় 'ধর্ম্ম বিভীষিকা'। সবচেয়ে চমকপ্রদ তথ্য পাওয়া যায় একটি সংবাদে।

'লাঙল'-এর চতুর্দশ সংখ্যায় একটি সংবাদ প্রকাশ হয়, 'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ীতেও প্রায় ৫০জন মুসলমান আশ্রয় নিয়েছিল। এজন্য অ-বাঙালী হিন্দুগণ ঠাকুর বাড়ী ঘেরাও করেছিল। তারা বলছিল যে মুসলমানদের তাদের হাতে ছেড়ে না দিলে তারা ঠাকুর বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দেবে। পুলিশের নিকটে ফোন করাতে কনস্টেবল ও গোরা পল্টন যখন আসে তখন এ সকল লোক পালিয়ে যায়। আশ্রিত মুসলমানদিগকে পুলিশের হেফাজতে লালবাজার পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

দাঙ্গার বিভীষিকাময় মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িতে মুসলমানরা যে আশ্রয় পেয়েছিল এবং তাদের নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা পয়েছিল; এ তথ্য চমকপ্রদ তো বটেই, দুর্লভও।

ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে নজরুল গোটা জাতিকে জাগ্রত হওয়ার আহবান জানিয়েছেন, স্বদেশের মুক্তি প্রত্যাশা করেছেন। উপনিবেশকে কায়েম রাখতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ স্পষ্টতই সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি করেছিল ভারতবর্ষে এবং তা সফলভাবে ব্যবহারও করেছিল। তারই পরিণতিতে ভারতের দুই বৃহৎ ধর্মসম্প্রদায়; হিন্দু-মুসলমান পরস্পর ভয়ানক রক্তঝরা দাঙ্গায় জড়িয়ে পড়েছে বারংবার। তার সঙ্গে ছিল স্থানীয় রাজনৈতিক দলের ইন্ধন। এই সাম্প্রদায়িক বিভেদ নজরুলকে ব্যথিত করেছে। তিনি সচেতনভাবে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রদায় নিরপেক্ষ সম্প্রীতি স্থাপন করতে প্রয়াসী হয়েছেন আজীবন। নজরুল চেয়েছেন সম্প্রদায়ের উর্ধ্বে মানুষের মুক্তি। হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতিকামী নজরুল বলেন ('বিংশ শতাধী', প্রলয় শিখা)

'কাটায়ে উঠেছি ধর্মনেশা; আফিম
ধ্বংস করেছি ধর্মপেশা; যাজকী
ভাঙি মন্দির, ভাঙি মসজিদ
ভাঙিয়া গির্জা গাহি সঙ্গীত,
এক মানবের একই রক্ত মেশা
কে শুনিবে আর ভজনালয়ের হ্রেষা।'

নজরুলের নিজের জীবনের অভিজ্ঞতাও কিন্তু তাঁর সম্প্রীতিচেতনার নির্মাণে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। বাবার মৃত্যুর পর মাত্র ন'বছর বয়স থেকেই নজরুলকে উপার্জনের পথে নামতে হয়। শৈশবেই তাঁকে মোল্লাগিরি, মাজারের খাদেম, মসজিদের ইমামতি; এই সব কাজ করতে হয়েছে। ইসলাম ধর্মের মূল

ভিত্তি জানতে এই সব পেশা নজরুলকে সাহায্য করেছে। ধর্মীয় ও পারিবারিক সূত্রেই অল্প বয়সে নজরুল জেনেছিলেন ইসলামি রীতিনীতি ও আদর্শ। ইসলামি রীতিনীতি আত্মস্থ করলেও নজরুল কেবল ইসলাম ধর্মেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। বিশেষ কোনো ধর্ম নয়, বরং সকল ধর্মের প্রতিই তাঁর মনে তৈরি হয়ে যায় ভক্তি ও ভালোবাসা। সুশীলকুমার গুপ্ত বলেছিলেন, 'যেখানে কীর্তন হত, কথকতা হত, যাত্রাগান হত, মৌলবীর কোরান পাঠ ও ব্যাখ্যা হত, দুরন্ত বালক গভীর আগ্রহ ও মনোযোগের সঙ্গে সেখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতেন। বাউল, সুফী, দরবেশ, সাধু, সন্নাসীদের সঙ্গে তিনি অন্তরঙ্গভাবে মিশতেন।'

পেট চালানোর জন্য নজরুলকে লেটোর দলে গান লেখার কাজ নিতে হয়েছিল। নিজস্ব ধর্মের বাইরে তাঁকে জানতে হয় রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত আর পুরানের নানা গল্প ও অনুষঙ্গ। ভারতীয় পুরাণ ও ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে তাঁর চিত্তলোক নতুন মাত্রায় উদ্ভাসিত হলো এবং আপন ঐতিহ্যের সঙ্গে মিশিয়ে তিনি নির্মাণ করতে সমর্থ হলেন তৃতীয় এক মাত্রা। পরবর্তীকালে নজরুলের কবিতা এবং গানে ভারতীয় মিথ পুরাণের যে বিপুল ও অনায়াস ব্যবহার দেখি তার বীজ প্রোথিত হয়েছিল লেটো দলের গান বাঁধতে গিয়ে। বৈবাহিক সূত্রেও হিন্দুধর্মের নানাকিছু নজরুলের পক্ষে জানা সহজ হয়েছে। প্রমীলার সঙ্গে বিয়ের অনুষঙ্গটি একবার স্মরণ করলে নজরুলকে বোঝা অনেক সহজ হয়ে যায়। হিন্দু ধর্মের কুমারী কন্যাকে বিবাহের মুহূর্তে নজরুল নানা প্রকার বাধার মুখে পড়েন, কেউ কেউ প্রমীলাকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বলেন। কিন্তু মুক্তমনা নজরুল তাতে রাজি হননি। বিয়ের আসরেও অনেকে বলেছিলেন, কনেকে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতে বলা হোক। কবি তাতে রাজি তো হলেনই না, উলটে স্পষ্ট করে জানিয়ে দেন, 'কারুর কোনো ধর্মমত সম্বন্ধে আমার কোনো জোর নাই। ইচ্ছে করে তিনি মুসলমান ধর্ম গ্রহণ কলে, পরেও করতে পারবেন।'

নজরুলের কবিতার মতো অসাম্প্রদায়িক গানের কারণেও সবসময় তিনি ছিলেন ধর্মান্ধদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু। মুসলমানরা বিভ্রান্ত হয়েছেন তাঁর সৃষ্টিতে দেব-দেবীদের আরাধনা দেখে, আবার হিন্দুরা খেপেছেন যখন তিনি বলেছেন 'আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান বুকে এঁকে দিই পদচিহ্ন।' এই নজরুলই আবার কালীকে নিয়ে শ্যামাসংগীত লিখেছেন 'কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন। (তার) রূপ দেখে দেয় বুক পেতে শিব যার হাতে মরণ বাঁচন।' আবার রসুলকে নিয়ে লিখেছেন নাত 'তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে। মধু পূর্ণিমারই সেথা চাঁদ দোলে। যেন ঊষার কোলে রাঙ্গা রবি দোলে।' আবার নজরুলের অনেক শ্যামাসঙ্গীত ও ইসলামি সঙ্গীত তেমন পরিচিতি পায়নি বা সমান জনপ্রিয় হয়নি। নজরুলের সর্বধর্মসমন্বয়ের চেষ্টা 'সবার' হয়ে ওঠেনি। গান জনপ্রিয় হওয়ার জন্য তৎকালীন গ্রামোফোন রেকর্ডের যথেষ্ট ভূমিকা ছিল। জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী, যিনি জ্ঞান গোসাঁই নামে অধিক পরিচিত ছিলেন, নজরুলের শ্যামাসঙ্গীত রেকর্ড করেন। লোকের মুখে মুখে ফিরতে লাগল সে গান,

'বল্ রে জবা বল্;
কোন্ সাধনায় পেলি শ্যামা মায়ের চরণতল'

অথবা

'কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন'।

১৯২৬ সালে নজরুল ইসলাম কৃষ্ণনগরে বিশিষ্ট বিপ্লবী হেমন্ত সরকারের বাড়িতে বেশ কিছু দিন সপরিবারে থাকেন। সেখানে তিনি কালীপুজো উপলক্ষে গান লেখেন,

'মোর লেখাপড়া হল না মা
আমি ম দেখিতেই দেখি শ্যামা
আমি ক লিখিতেই কালী বলে
(মা) নাচি দিয়ে করতালি।'

আরও যত শ্যামাসঙ্গীত লিখেছিলেন তিনি, সব অবশ্য জনপরিচিতি পায়নি। গায়ক আব্বাসউদ্দিনের বিশেষ অনুরোধে নজরুল লিখলেন ইসলামি সঙ্গীত। সে রেকর্ডের গানও তুমুল জনপ্রিয় হয়েছিল। মানুষ পথেঘাটে গাইত, 'ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ' বা 'আমিনা-দুলাল নাচে হালিমার কোলে।' যে সব ইসলামি গান সাধারণ মানুষের মনে স্থান করে নিয়েছিল, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে তা কিন্তু আজও মানুষ আনন্দের সঙ্গে গান। অবশ্য স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে নজরুলের 'ইসলামি' সঙ্গীতে ব্যবহৃত 'হামদ', 'নাত' ইত্যাদি শব্দ হিন্দু বাঙালির কাছে একেবারেই অপরিচিত।

নজরুল ছিলেন ধর্মের প্রাতিষ্ঠানিকতার বিরুদ্ধে। সারাটা জীবন ধরে, তাঁর সর্বস্ব বাজি রেখে কবি তাঁর কবিতায়, প্রবন্ধে, বক্তৃতায় সব রকম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের বিরোধিতা করেছেন। তাঁর সমকালে বা পরবর্তী সময়ে দুই বাংলার কোথাও এ কাজে তাঁর যোগ্য উত্তরসূরি বা তাঁর যোগ্য অনুসারী কাওকে দেখি না। নজরুল তার সারাটা জীবনে কখনো ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেননি, করেছেন ধর্ম ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে। তিনি সারাজীবন চেষ্টা করেছেন ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রাখার আর তার কারণেই মানবধর্মের উপর তিনি বারবার জোড় দিয়েছেন, বলেছেন শোষণহীন সমাজের কথা। জানতেন, শোষনহীন সমাজ ছাড়া ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায়

রাখা সম্ভব নয়। সম্ভব নয় যথার্থ মানবধর্ম প্রতিষ্ঠা। সাংবাদিক এবং সম্পাদক হিসেবেও নজরুল এ কাজে তাঁর যোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন। খবর, নিবন্ধ, প্রবন্ধ, রম্যরচনা এবং তাঁর সাহসী সম্পাদকীয় ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে একদিকে শাসকদের অত্যাচার, অবিচার, শোষণ এবং অন্যদিকে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের জড়তা, দুর্নীতি ও ভণ্ডামির বিরুদ্ধতাতেও ভিন্ন এক নজরুলকে পেয়েছি আমরা।

বুঝতে অসুবিধে নেই যে তিনি তাঁর প্রত্যহিক যাপনে ছিলেন অসাম্প্রদায়িক। সেখানে কোনও সমঝোতা বা বোঝাপড়া ছিল না। তাঁর বিবাহ পারিবারিক জীবন সন্তানের নামকরণ যাবতীয় লেখালিখি গান কবিতা;

সর্বত্র তার প্রতিফলন। তা এতটাই আন্তরিক এবং স্বচ্ছ যে আজও দুই বাংলায় তার সমান্তরাল কোনও কিছুই খুঁজে পাওয়া যায় না। গোলাম মুরশিদ যথার্থই বলেছেন, 'সাহিত্যের মান বিচার করলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের কোনো তুলনা চলে না, কিন্তু ঐহিত্য সমন্বয়ের প্রশ্ন উঠলে স্বীকার করতেই হবে যে, নজরুল যেমন করে হিন্দু-মুসলিম ঐহিত্যের সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তা আদৌ করতে পারেননি। করার চেষ্টাও করেননি। বস্তুত, বাড়ির কাছের পড়শিদের প্রাঙ্গণের ধারে গেলেও তিনি তাদের বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করেননি। অপর পক্ষে, নজরুল তা কেবল করেননি, সার্থকভাবে করেছিলেন। তিনি যেভাবে তৎসম-তদ্ভব শধের সঙ্গে আরবি-ফারসি শধের মিলন ঘটিয়েছিলেন, তাও একমাত্র তারই রচনায় দেখা যায়।'

নজরুল সেই পথে ছিলেন একাকী এক যাত্রী। আজকেও দুই বাংলা মিলিয়ে তাঁর পথের অনুসারী কোনও কবি-লেখক পাই না। বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায় বা শরৎচন্দ্রের মতো আরও কয়েকজন হিন্দু লেখক হয়তো বিভিন্ন সময়ে মুসলমান জীবন ও সমাজ ও জীবন নিয়ে গল্প লেখার চেষ্টা করেছেন কিন্তু তার মধ্যে মুসলমানের বিশ্বাস ধরা ছিল না। বছরের পর বছর পাশাপাশি বাস করেও বাংলা সাহিত্যে মুসলমান প্রায় কোথাও নেই বললেই চলে। একই রকমের উলটোটা আমরা পাই বাংলাদেশের সাহিত্যে। পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াংশের এই গরহাজিরা আমাদের সাহিত্যকে নিশ্চিতভাবেই করে রেখেছে একপেশে।

সাহিত্যের এই অবস্থা যে কাম্য নয় তা নজরুলের চেয়ে আর কেই পারে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে। ❐

বাংলাদেশের গণ-অভ্যুত্থান এবং ভারতবিরোধিতার রাজনীতি

অজিতকুমার রায়

গণ-অভ্যুত্থান না বিপ্লব ?

দেশভাগের পূর্ব মুহূর্তে যখন কেবিনেট মিশনের সঙ্গে সব পক্ষের আলোচনা চলছিল, সেই সময় ধর্মের ভিত্তিতে দেশ-ভাগ কেন কোন সমস্যার সমাধান করতে পারবে না, সেই কথা ব্যাখ্যা করে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর লেখা 'ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডম' বইতে উল্লেখ করা সেই বিবৃতিতে তিনি অন্য অনেক কারণের সঙ্গে এই কথাও বলেছিলেন যে 'দুটি রাষ্ট্র একে অপরের মুখোমুখি হলে পরস্পরের সংখ্যালঘুদের সমস্যার কোন সমাধান হবে না, বরং (সেই রাষ্ট্রদুটোকে) পারস্পরিক জিম্মি ব্যবস্থা চালু করে কেবল প্রতিশোধ এবং বদলা নেওয়ার দিকে পরিচালিত করবে।' আজ দেশভাগের এত বছর পরে এই উপ-মহাদেশের সকলেই আমরা নিশ্চয়ই সেই কথা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারছি এবং বুঝতে পারছি যে তিনি যথার্থই দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মানুষ ছিলেন।

গত বছরের জুলাই-আগস্ট মাসে বাংলাদেশের ছাত্র-আন্দোলনের প্রেক্ষিতে যে রাজনৈতিক পালাবদল ঘটেছে, তারপর থেকে বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সম্পর্কের অনেক জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। দুই দেশের মধ্যে মানুষ ও পণ্য চলাচলকে সহজতর করার উদ্দেশ্যে ইতিপূর্বে গৃহীত সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা হচ্ছে। আমরা যদি খেয়াল করি তবে দেখতে পাবো যে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক ঘূর্ণিঝড়ের এই বাতাবরণের মধ্যে সবচেয়ে বিপদের মধ্যে পড়েছেন দুই দেশের সংখ্যালঘু মানুষ। তাদেরকে জিম্মি করেই রাজনীতির চাল দেওয়া চলছে, সম্পর্কের নতুন বয়ান তৈরি হচ্ছে। দুর্ভাগ্যজনক হলো এমন পরিস্থিতির মাঝে আমাদের দেশে এমন একটি রাজনৈতিক দল অন্যতম প্রধান শাসক দল হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে যার রাজনৈতিক দর্শনই হলো সাম্প্রদায়িক ঘৃণা ছড়ানো। দুই রাষ্ট্রের

সম্পর্কের মধ্যেও তাই সাম্প্রদায়িকতার বিষবাস্প নতুন করে ফেনিয়ে উঠছে। এই উপমহাদেশের মানুষ হিসাবে সাম্প্রদায়িকতাকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করার অভিশাপ গত এক শতাধী ধরে আমরা বহন করে চলেছি।

বলা বাহুল্য যে গত বছরের বাংলাদেশের জুলাই বিক্ষোভ ও অভ্যুত্থানের ঘটনা সাম্প্রতিক সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যতম রাজনৈতিক আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। কি ঘটেছে তার নানা রকম ব্যাখ্যা উপস্থিত হয়েছে। কেউ বলছেন জুলাই 'বিপ্লব', কেউ বলছেন ছাত্র-জনতার বিপ্লব, কেউ বলছেন গণ-অভ্যুত্থান ইত্যাদি। 'বিপ্লব' শব্দটা সেই সমস্ত আন্দোলনের ক্ষেত্রেই ব্যবহার করার কথা যে আন্দোলনের মাধ্যমে রাষ্ট্রের শ্রেণি-চরিত্রের মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়। কিন্তু হর-হামেশাই অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটলে তার সাথে 'বিপ্লব' শব্দটা জুড়ে দিয়ে আমরা তাকে মহিমান্বিত করতে ভালোবাসি, বাংলাদেশও ব্যতিক্রম নয়। যেমন, সামরিক ক্যু-এর মাধ্যমে জিয়া ক্ষমতা দখল করেছিলেন, জিয়া-পন্থী ভক্তরা তাকে 'সিপাহী-জনতার বিপ্লব' বলতে ভালোবাসেন। বাংলাদেশের ঘটনার পর, গত বছরের ডিসেম্বরের শেষ দিকে একটি ডিজিটাল পোর্টালে সাঈদ ইফতেখাব আহমেদ ধারাবাহিকভাবে পাঁচটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। সেখানে তিনি লেখেন, 'বাংলাদেশের জুলাই বিপ্লব, বিপ্লবের ইতিহাসে একটা ক্লাসিক উদাহরণ হয়ে থাকবে। ফরাসি বিপ্লব, রুশ বিপ্লব, গণচীন এবং কিউবার বিপ্লব; বিপ্লবের যে ধারা তৈরি করেছে তার বাইরে গিয়ে একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারায় তরুণ প্রজন্ম বা স্পষ্ট করে বললে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজের নেতৃত্বে এ বিপ্লব সম্পন্ন হয়েছে।' এমন যুক্তিহীন দাবি একমাত্র বোধহীন আবেগের বশেই করা সম্ভব। অগাস্টের পর থেকে ঘটনা-প্রবাহ যে পথে প্রবাহিত হচ্ছে তা দেখে তিনি এখন কি ভাবছেন সেটা অবশ্য জানি না।

'বিপ্লব' শব্দটা সেই সমস্ত আন্দোলনের ক্ষেত্রেই ব্যবহার করার কথা যে আন্দোলনের মাধ্যমে রাষ্ট্রের শ্রেণি-চরিত্রের মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়। কিন্তু হর-হামেশাই অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটলে তার সাথে 'বিপ্লব' শব্দটা জুড়ে দিয়ে আমরা তাকে মহিমান্বিত করতে ভালোবাসি, বাংলাদেশও ব্যতিক্রম নয়।

গত জানুয়ারি মাসে Institute of Development Studies– Kolkata-তে বাংলাদেশ প্রসঙ্গে একটা আলোচনা সভা ছিল। সেখানে অন্যতম বক্তা হিসাবে ছিলেন Centre for Studies in Social Sciences–Kolkata-এর রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক ড. মইদুল ইসলাম। তিনি তাঁর গবেষণার স্বার্থে বাংলাদেশের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। তিনি বললেন ,'বাংলাদেশে যেটা ঘটেছে সেটা এক কথায় 'প্রতি-বিপ্লব'। ' এমন মত প্রকাশ করেছেন আরো অনেক বিশেষজ্ঞ। যেমন, American Enterprise Institute (AEI)-এর গবেষক ডঃ মাইকেল রুবিন ১৮ই মার্চ, ২০২৫ -"Is Bangladesh the next Afghanistan?' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। সেখানে তিনি লিখেছেন, 'নতুন বাংলাদেশী শাসনব্যবস্থা হিজব-উত-তাহরীর ও খিলাফত-এ-মজলিসের সন্ত্রাসীদেরও জেল থেকে মুক্তি দিয়েছে। আজকের বাংলাদেশ ২০০০ সালের আফগানিস্তানের মতো। বাংলাদেশে এখন Khelafat-এ-Majlis– Allahr Dal– এবং Ahle Hadith Andolon হেফাজত-এ-ইসলামের আড়ালে একত্রিত হয়ে সারাদেশে 'বাংলাদেশ আফগানিস্তান হবে, আর আমরা তালেবান হব'; এই ব্যানারের তলে ইসলামি বিধান প্রতিষ্ঠা করতে কাজ করছে।' জুলাই আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচি হিসাবে বঙ্গবন্ধুর বাড়ি ভাঙ্গা, বঙ্গবন্ধুর মূর্তি ভাঙ্গা ও মুক্তিযোদ্ধাদের জুতোর মালা পরিয়ে চূড়ান্ত অপমান করা, বেগম রোকেয়ার মূর্তির মুখে কালি লেপন, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) অফিস দখল করতে যাওয়া, বাংলাদেশ জুড়ে শতাধিক মাজার ভাঙ্গা, সংখ্যালঘুদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া, অসংখ্য মানুষকে, পুলিশ প্রশাসনের কর্মী (গর্ভবতী নারীও আছেন), আওয়ামী লীগ কর্মী, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ব্যক্তিকে - পিটিয়ে হত্যা করে বিভিন্ন জায়গায় পা বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা, শিল্প-কলা অ্যাকাডেমিতে নাটক বন্ধ করা, নারী ফুটবল খেলা বন্ধ করা, বাউল মেলা বন্ধ করে দেওয়া, লালন উৎসব করতে না দেওয়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বকুলতলায় দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যবাহী 'শরৎ উৎসব' বানচাল করে দেওয়া, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ইসলাম অনুমোদিত নয় বলে ভাস্কর্য্য ও ম্যুরাল ভেঙ্গে ফেলা, নারীদের উপর ইসলামী পোশাকবিধি চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা এবং রাস্তায় প্রকাশ্যেই নারীদের ইসলামসম্মত পোষাক নয় বলে অপমান করা, রাস্তায় ধরে ধরে বাউল সম্প্রদায়ের মানুষের দাড়ি-গোঁফ-চুল জোর করে কেটে দেওয়া ইত্যাদি অসংখ্য ঘটনা নিঃসন্দেহে ড. রুবিনের পর্যবেক্ষণের পক্ষে

কথা বলে। গতবছরের ৫ই অগাস্টের পর থেকে যেভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের ও মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তিদের স্মৃতিসৌধ, মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক নিদর্শন, মিউজিয়াম ও স্থাপত্য ইত্যাদি আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠেছে তাতে জুলাই আন্দোলনের 'হিডেন এজেন্ডা' আজ হয়ত অনেকটাই পরিস্কার। উল্লেখ্য যে সরকার প্রধান মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী এই সমস্ত কুকর্মের একটিরও নিন্দা জানান নি, উপরন্তু রাষ্ট্রীয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধকে স্মরণ করার, সম্মান ও শ্রদ্ধা জানানোর দিবসগুলো বন্ধ করে দিয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে যাঁরাই কথা বলছেন, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী , তাদেরকে দেশরক্ষা আইনে বা খুনের আসামী হিসাবে জেলে পুরে দিচ্ছেন। সর্বোপরি ৫ই অগাস্টের পর থেকে জুলাই আন্দোলনকারীদের যে অংশ শ'য়ে শ'য়ে মানুষকে, পুলিশ, সাংবাদিক, আওয়ামী লীগ সমর্থক, সংখ্যালঘু জনগণ , হত্যা করেছে, নারীদের ধর্ষণ করেছে, সাধারণ মানুষের সম্পত্তি ধ্বংস করেছে, ঘর-বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করেছে, লুট-পাট করেছে তাদের কারোর বিরুদ্ধে কোন আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না বলে 'ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ' জারী করেছে , যা একমাত্র অসভ্য শাসকের দেশেই হওয়া সম্ভব। এমন ঘটনাবলীতে অভ্যুত্থান পরবর্তী সরকারের নির্লিপ্ততা এইসব দুর্বৃত্তদের কাজের প্রতি নির্দিষ্টভাবে সরকারের প্রশ্রয় এবং পরোক্ষ মদতের ইঙ্গিত আছে সেই বিষয়ে কারো মনে সন্দেহ থাকার কোন অবকাশ নেই।

মৌলবাদী শক্তির সাথে হাসিনার আপস

যাই হোক, গত বছরের জুলাই-অগাস্ট মাসে বাংলাদেশে আর যাই ঘটে থাকুক সেটা যে বিপ্লব নয় তা আমরা বুঝতে পারি। সন্দেহ নেই, বারংবার প্রহসনের নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে শেখ হাসিনার দীর্ঘদিনের স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ও লাগামহীন দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনমানুষের মনে পুঞ্জীভূত প্রবল ক্ষোভ এই আন্দোলনের অন্যতম মূল অনুঘটক হিসাবে কাজ করেছে। আজ যে ধর্মভিত্তিক দক্ষিণপন্থী শক্তির উত্থান দেখা যাচ্ছে তার পেছনেও শেখ হাসিনা সরকারের দায় রয়েছে। ২০১৩ সাল থেকে হেফাজতে ইসলামের নেতৃত্বে যে মৌলবাদী শক্তির উত্থান শুরু হয়, হাসিনা তাঁর ক্ষমতাকে ধরে রাখার জন্য তাদের সাথে আপোষের রাস্তায় হাঁটতে শুরু করেন। ২০১৬ সালে হেফাজতের চাপের মুখে সরকার জাতীয় পাঠ্যক্রম থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, কাজী নজরুল ইসলাম, লালন ফকির, হুমায়ুন আজাদ প্রভৃতি লেখকদের কবিতা ও ছোটগল্পসহ ১৬টি সাহিত্যকর্ম এই মর্মে সরিয়ে নেয় যে সেগুলো ইসলামবিরোধী ও হিন্দুত্বের প্রকাশ। এই সময়ে অনেক ধর্মনিরপেক্ষ লেখক ও লিঙ্গবৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলনের কর্মীদের পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়। সংঘটিত হত্যাকাণ্ডে যুক্তদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ও আইনী ব্যবস্থা নেওয়ার পরিবর্তে হাসিনা সরকার বরং আক্রান্ত মুক্তচিন্তকদের প্রকাশ্যে হুঁশিয়ারী দিয়ে বলেন আল্লাহ বা মহানবী মুহাম্মদ (স.) সম্পর্কে সমালোচনামূলক মন্তব্য সহ্য করা হবে না। অনেকেরই স্মরণ থাকার কথা যে হাসিনা ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি 'মদিনা সনদ' মেনে দেশ পরিচালনা করবেন। এই সময়ই তিনি ইসলামপন্থী কট্টরদের দাবী মেনে সুপ্রিমকোর্টের সামনে থেকে ন্যায়-বিচারের প্রতীক গ্রিক দেবী থেমিসের মূর্তি সরিয়ে দেন। শুধু তাই নয়, হাসিনা সরকার যে 'ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন' প্রণয়ন করে তাতে ধর্ম অবমাননা ধারা যুক্ত হয়। এই আইন প্রয়োগ করেই কট্টর ইসলামপন্থীদের চোখে মুসলীম ভাবধার বিরোধী সুফি গায়িকা রিতা দেওয়ান সহ একাধিক শিল্পিকে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের অভিযোগে আটক করা হয়। ইসলামপন্থী মতাদর্শে গঠিত মাদ্রাসা শিক্ষার প্রদত্ত ডিগ্রিগুলোকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির সমমর্যাদা দান করেন। ফলে স্বৈরতান্ত্রিক হাসিনার বিরুদ্ধে জুলাই আন্দোলনে উদারপন্থী এবং বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তি একটি উল্লেখযোগ্য নিয়ামক শক্তি হিসাবে উপস্থিত থাকলেও, আন্দোলন পরবর্তী সময়ে তাদের হাত থেকে নেতৃত্ব কেড়ে নেওয়ার মতো শক্তি ইসলামপন্থী জঙ্গীরা আগেই অর্জন করেছিল।

মানুষের ক্ষোভ, আকাঙ্খা, স্বপ্ন, আবেগ ও আত্মত্যাগকে কাজে লাগিয়ে, দেশি-বিদেশি অনেক শক্তি এবং নানা স্বার্থান্বেষী মহলের 'মেটিকুলাস ডিজাইন'-এর মাধ্যমে স্বাধীনতাবিরোধী একটি রাজনৈতিক শক্তির ক্ষমতায় আসাকে প্রগতিশীল অংশ প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

মানুষের ক্ষোভ, আকাঙ্খা, স্বপ্ন, আবেগ ও আত্মত্যাগকে কাজে লাগিয়ে, দেশি-বিদেশি অনেক শক্তি এবং নানা স্বার্থান্বেষী মহলের 'মেটিকুলাস ডিজাইন'-এর মাধ্যমে স্বাধীনতাবিরোধী একটি রাজনৈতিক শক্তির ক্ষমতায় আসাকে প্রগতিশীল অংশ প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হয়েছে। দেশের বামপন্থী ও

প্রগতিশীল অংশ যাঁরা হাসিনার অপশাসনের বিরুদ্ধে এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিল তাদের কোন কোন অংশ এখন বুঝতে পারছেন যে তাঁরা প্রতারিত হয়েছেন। এই শতাধীতে বিভিন্ন দেশে এই জাতীয় তরঙিন বিপ্লবদ সংঘটিত হওয়ার পর সেইগুলো যে আমেরিকার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মদতে হয়েছে তা এখন সকলেই জানেন। ২০০৩ সালে জর্জিয়ার 'গোলাপী বিপ্লব', ২০০৪ সালে ইউক্রেনের 'কমলা বিপ্লব', ২০০৫ সালে কিরগিজস্তানের 'টিউলিপ বিপ্লব', অথবা ২০১১ সালে এশিয়া ও আফ্রিকার 'আরব বসন্ত' ইত্যাদি তার প্রমাণ। দেশে দেশে ঘটে যাওয়া এইসমস্ত রঙিন বিপ্লব প্রসঙ্গে চিনের কমিউনিস্ট পার্টি ও সরকার নিয়ন্ত্রিত পত্রিকা 'গ্লোবাল টাইমস' লিখেছে- 'গত কয়েক দশক ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 'রঙিন বিপ্লব' পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন করেছে, অথবা বিশ্বের অনেক জায়গায় বারুদ ছাড়াই যুদ্ধ করেছে, উন্মত্তভাবে 'আমেরিকান মূল্যবোধ' রপ্তানি করেছে। 'গণতন্ত্র' এর নামে সরাসরি সামরিক অভিযান শুরু করার পরিবর্তে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রঙিন বিপ্লবকে অন্যান্য দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে পছন্দ করে, যাতে সরকারকে উৎখাত করে তার বিশ্বব্যাপী নিয়ন্ত্রণ জোরদার করা যায়। এই পদ্ধতিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষাকৃত দক্ষ এবং আর্থিক দিক থেকে সুবিধাজনক বলে মনে করে। (গ্লোবাল টাইমস, ২০২১)

এইসব আন্দোলন সংগঠিত করতে USAID ছাড়াও আমেরিকার "National Endowment for Democracy" (NED) কোটি কোটি ডলার ব্যয় করে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিসন্ধি বোঝার প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে আমেরিকা বহুদিন ধরেই '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে তাদের তৎকালীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের সহযোগী 'জামায়েত ইসলাম'-কে বাংলাদেশের রাজনীতিতে গ্রহণযোগ্য করে তোলার চেষ্টা করে আসছে এবং প্রকাশ্যেই বলে আসছে যে জামায়েত ইসলাম গণতান্ত্রিক শক্তি। বাংলাদেশের ৫ই অগাস্টের ঘটনার বহুদিন আগে থেকেই এই উপ-মহাদেশের একদল 'ফ্রি-লান্স' সাংবাদিক, ফেসবুক সেলিব্রেটি, বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ও অধ্যাপক, ইউ-টিউব ইনফ্লুয়েন্সার যেভাবে 'জামায়েত ইসলাম'-কে বাংলাদেশের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে নানা রকম আলোচনা, প্রবন্ধ লেখা ইত্যাদি শুরু করেছিল, তাতে এইসবের পেছনে NED-র ডলার কাজ করেছিল বলে অনেকে অনুমান করেন। দুইদেশের কোন কোন 'ফ্রি-ল্যান্স' সাংবাদিক হঠাৎ করেই 'জামায়েতের মানবাধিকার' প্রসঙ্গ তুলে 'ভিকটিম' আবেগকে কাজে লাগিয়ে তাদের রাজনৈতিক পুনর্বাসনের জমি তৈরি করার কাজে প্রবল প্রচারে নেমে পড়েছিল।

এইসব বিশ্লেষকদের মূল উদ্দেশ্য হ'য়ে ওঠে এক নতুন রাজনৈতিক ভাষ্য তৈরি করা, যা হবে মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষিত এবং তার সাথে ভারতের সংশ্লিষ্টতার এক নেতিবাচক বয়ান। বঙ্গবন্ধু সহ সমস্ত মুক্তিযোদ্ধাদের অবদানকে বা মুক্তিযুদ্ধকেই স্বাধীনতার আন্দোলন বলে অস্বীকার করা, ১৯৭১-এর স্বীকৃত মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে ভারতীয় বয়ান বলে দাঁড় করানো এবং অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে মুজিবর রহমানের বিকল্প হিসাবে 'মজলুম জনতা'-র উপেক্ষিত নেতারূপে ভিন্ন চরিত্রদের তুলে ধরা। যেমন, বদরুদ্দিন উমরের মতো বুদ্ধিজীবী বারংবার বলেছেন যে মুজিবর রহমান মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দেওয়া তো দূরের কথা তিনি মুক্তিযুদ্ধই করেন নি। যে বালখিল্য যুক্তিতে তিনি এমন অনৈতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তাকে মান্যতা দিলে আমাদের বলতে হবে গান্ধীজীও '৪২-এর 'ভারত ছাড়ো আন্দোলন'-এ নেতৃত্ব দেন নি, অংশগ্রহণও করেন নি। একইভাবে বলতে হয় যে দক্ষিণ আফ্রিকার ঐতিহাসিক বর্ণবৈষম্য (Apartheid) বিরোধী সংগ্রামে নেলসন ম্যান্ডেলা অংশগ্রহণ করেননি। কারণ, নেলসন ম্যান্ডেলার অহিংস আন্দোলনের উপর ১৯৬০ সালে Shapeville Massacre ঘটার পর, তিনি সংগ্রামের কৌশল পরিবর্তন করেন এবং ANC-এর নতুন সশস্ত্র শাখা 'Umkhonto we Sizwe' গঠন করেন, যার মাধ্যমেই আন্দোলন এক সময় বিজয়লাভ করে। কিন্তু গঠনের পরই নেলসন ম্যান্ডেলা গ্রেপ্তার হয়ে যান এবং আন্দোলনে জয়লাভ করার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত (১৯৬২-১৯৯০) তিনি কারাগারেই ছিলেন। অহংবোধে আচ্ছন্ন এক ইতিহাসবোধ থেকেই বদরুদ্দিন উমর প্রচার করেছেন যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের যে ইতিহাস পাঠ করা হয় তার ৯০ শতাংশই ভুল, কারণ মুজিবর রহমানের তো কোন ভূমিকাই মুক্তিযুদ্ধে ছিল না।

দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সুসম্পর্ক ও ভারতের স্বার্থ

ভারত এবং বাংলাদেশ দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্র। অনেক বিষয়েই দুই দেশের স্বার্থ পরস্পরের সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে , বাম এবং ডান উভয় তরফে , শেখ হাসিনা শাসন ক্ষমতায় আসার পরে, বিশেষতঃ গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে, একটি বয়ান বহুলভাবে চর্চিত এবং দৃঢ়ভাবে জনসাধারণের মনে সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত, তা হলো, ত্বাংলাদেশ ভারত যা যা চায় সব দিয়েছে, কিন্তু ভারত বাংলাদেশকে

কিছুই দেয় নি। 'এই বয়ানের করোলারি হিসাবে যে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত সর্বজনগ্রাহ্য হিসাবে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বা বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠী রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে মানুষের মনে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে, তাহলো , 'এই অবস্থা সম্ভব হয়েছে ভারতের আধিপত্যবাদের জন্য এবং ভারতের সহায়তায় নিজেকে শাসন ক্ষমতায় রাখতে শেখ হাসিনার নতজানু নীতির জন্য।' বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের সকল অংশের মধ্যে যে ভারতবিদ্বেষী মনোভাব তার মূল প্রোথিত আছে গত দেড় দশকে গড়ে তোলা এই দৃঢ় প্রত্যয়কে ভিত্তি করে। শেখ হাসিনা সহ বাংলাদেশের আওয়ামী লীগের নেতা-নেত্রীদের অরাজনীতি সূচক, বালখিল্য সুলভ কথাবার্তায় সেই প্রত্যয় মানুষের মনের মধ্যে আরো গভীর হতে সাহায্য করেছে। যেমন, এক নেতার একটি কথা খুবই আলোড়ন তুলেছিল, 'ভারতের সাথে আমাদের সম্পর্ক স্বামী-স্ত্রীর মতো।' তেমনি, শেখ হাসিনা একবার কোন প্রসঙ্গে সংবাদ মাধ্যমের কাছে বলেছিলেন , 'আমি ভারতকে যা দিয়েছি, তা ভারত কখনো ভুলবে না।' কি প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা এই কথা বলেছিলেন তার প্রাসঙ্গিকতা মানুষের কাছে বিবেচ্য থাকে নি। বিরোধী রাজনীতিবিদ, এন-জি-ওর মাধ্যমে পোষ্য সুশীলসমাজ এবং রহস্যজনকভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠা দেশ-বিদেশের ফ্রি-ল্যান্স পণ্ডিত সাংবাদিকদের বারংবার উচ্চারণে এই কথা মানুষের মনে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয়ে যায় , 'ভারতের দাসী' শেখ হাসিনা ভারতকে সব দিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু বিনিময়ে আমরা কিছুই পাই নি। কি এক রহস্যময় কারণে জানি না, বাংলাদেশের শাসক দলের পক্ষ থেকেও দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্কের কারণে বাংলাদেশ কোন কোন ক্ষেত্রে কি অর্জন করেছে তা মানুষের কাছে পরিস্কার করার কোন প্রচেষ্টাও ছিল না।

একথা ঠিক যে বাংলাদেশ সরকারের সাথে সু-সম্পর্ক বজায় থাকায় ভারতের মূলত দুইটি গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ অর্জন হয়েছিল - প্রথমটি নিরাপত্তাজনিত এবং দ্বিতীয়টি আঞ্চলিক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার আকাঙ্খা। আমরা জানি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাতটি রাজ্যে বিভিন্ন আঞ্চলিক জাতি গোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করেন। অঞ্চলটি তিনদিক থেকে চিন, মায়ানমার এবং বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে বেষ্টিত। এই অঞ্চলের যেকোন ধরনের অস্থিরতা ভারত নিরাপত্তার পক্ষে ঝুঁকিপূর্ণ মনে করে। দীর্ঘদিন ধরে, বিশেষত বিএনপির আমলে, উত্তর- পূর্বাঞ্চলের বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীগুলোর কোন কোন সশস্ত্র গ্রুপ বাংলাদেশে ঘাটি করে তাদের তৎপরতা চালাত। বিদেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করত। বিএনপির আমলে এই সমস্ত সশস্ত্র গোষ্ঠীর জন্য বিদেশ থেকে ১০ ট্রাক অস্ত্র আমদানী হচ্ছিল যা চিটাগাং পোর্টে ধরা পড়ে। ভারত চেয়েছিল সেই সব ঘাটি ভেঙ্গে দেওয়া হোক এবং বিদ্রোহীদের গ্রেপ্তার করে ভারতের হাতে তুলে দেওয়া হোক। শেখ হাসিনার সরকার ভারত সরকারের সেই আশা পুরণ করেছিল।

দ্বিতীয়ত, ভারত 'লুক-ইস্ট' পলিসির কারণে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সহজে পণ্য পরিবহনের জন্য উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা (connectivity) গড়ে তুলতে চেয়েছে। ভারতের অর্থনীতির প্রসারের জন্য সেই যোগাযোগ প্রকল্প খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার কথা। স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশ সহযোগী হিসাবে এই প্রকল্পে অংশ নিলেই একমাত্র এর সূচনা ঘটতে পারে, কারণ বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে সড়ক ও রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা ভিন্ন অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে যোগাযোগের এই প্রকল্প বাস্তবায়ন কোনভাবেই সম্ভব না। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে একই সাথে ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোতে ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে যোগাযোগ ব্যবস্থাও সহজ, দ্রুত ও ব্যয়-সাশ্রয়ী হতো। এটা এমন নয় যে এই আপেক্ষিক সুবিধা শুধু ভারত ভোগ করত, এই যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হলে বাংলাদেশেরও আভ্যন্তরীণ ও আন্তঃরাষ্ট্র পণ্য চলাচলের এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুবিধা হতো। হাসিনা সরকার এই ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সম্মত ছিল। এই লক্ষ্যে রেল ও সড়ক ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য দুই দেশের মধ্যে অনেকগুলো সমঝোতা চুক্তি হয়েছিল। ভারত বাংলাদেশকে প্রায় ৮ বিলিয়ন ডলার 'LoC' (Line of Credit) দিয়েছে, যার মধ্যে সম্ভবত ২ বিলিয়ন ডলার অনুদান, বাকি অংশ খুব কম সুদে ,বছরে ১ শতাংশ হারে , ঋণ হিসাবে। (কবীর, ২০২২) এই 'LoC'-এর ঋণ সহায়তায় বাংলাদেশের পরিকাঠামো উন্নয়নে ভারতের প্রায় ৩০টার মতো প্রজেক্ট চলছিল। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে ভারত ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট চেয়েছে, কিন্তু এর জন্য যে পরিকাঠামো গড়ে তোলা দরকার তার কাজই শেষ হয় নি। শুধুমাত্র নীতিগতভাবে দুই পক্ষ সম্মতি পত্রে স্বাক্ষর করেছে।

সুসম্পর্ক নিয়ে বাংলাদেশের ভিন্ন বয়ান এবং সত্যতা

দ্বি-পাক্ষিক স্বার্থে হাসিনা সরকারের সাথে ভারতের এই সুসম্পর্ক বিষয়ে বাংলাদেশের হাসিনার বিরোধী রাজনৈতিক শক্তির মতামত ভিন্ন। প্রথম আলো পত্রিকায় প্রকাশিত একজন বুদ্ধিজীবীর প্রতিবেদন থেকে একটি বাক্য উল্লেখ করলে ভারত ও শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে বাংলাদেশীদের ক্ষোভের কারণ এবং

চাওয়া-পাওয়ার খতিয়ান পরিস্কার হবে। তিনি লিখেছেন, 'হাসিনা সরকার একদিকে ভারতকে একতরফাভাবে ট্রানজিট, বন্দর, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে ব্যবসাসহ নানা ধরনের সুবিধা দিয়ে গেছে, অন্যদিকে ভারত বাংলাদেশকে আন্তসীমান্ত নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা দেয়নি এবং সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে একের পর এক বাংলাদেশি নাগরিককে হত্যা করেছে।' (মোস্তফা, ২০২৪; তালুকদার, ২০২৫) ভারত 'একতরফাভাবে' বাংলাদেশ থেকে শুধুই নিয়েই গেছে, বিনিময়ে ভারত থেকে তারা কিছুই পায় নি, এমন একটি বয়ান বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে খুব পরিকল্পিতভাবেই জনপ্রিয় করে তোলা হয়েছে। এই 'একতরফাভাবে' ভাবনা কতটা বাস্তব তথ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আর কতটাই বা ভারতবিরোধী রাজনৈতিক অবস্থানের সুবিধার্থে কোন কোন শক্তির পরিকল্পিত নির্মাণ ও প্রচার, তা বিচার করার দাবী রাখে।

ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বয়ে চলা ৫৪ টি অভিন্ন নদীর জল সুখা মরশুমে বন্টনের চুক্তি করার দাবী বাংলাদেশ করে আসছে। শেখ হাসিনা প্রথমবার (১৯৯৬) ক্ষমতায় আসার পর ভারতের সাথে ৩০ বছর মেয়াদী গঙ্গার জলবন্টন চুক্তি হয়েছে, কিন্তু অন্যান্য নদীর জল নিয়ে কোন চুক্তি হয় নি। এদের মধ্যে সবচেয়ে প্রবল দাবি ছিল সুখা মরশুমে তিস্তার জলের ন্যায্য ভাগ পাওয়া। দুই দেশের মধ্যে তিস্তার জল-বন্টন নিয়ে চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার পরও, আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বিরোধিতায় , যেহেতু ভারতের ফেডারেল স্ট্রাকচারের জন্য জল নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে রাজ্যের সম্মতি প্রয়োজন হয় - তা শেষ মুহূর্তে স্বাক্ষরিত হয় নি। ন্যায্যতার ভিত্তিতে বাংলাদেশের জল পাওয়ার কথা। স্বাভাবিক কারণেই তিস্তার জল না পাওয়া বাংলাদেশের মানুষ খুব ভালোভাবে নেয় নি এবং এই বঞ্চনা তাদের জাতীয় ইস্যু হয়ে উঠেছে। ভারত নদীর উজানে আছে বলে নিজের মর্জিমতো জল আটকে দেবে তা আন্তর্জাতিক আইনেরও বিরোধী এবং মানবিকও নয়। স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের কাছে কেন্দ্রীয় সরকারের জলবন্টন চুক্তি কার্যকর করতে না পারাকে আধিপত্যবাদী আচরণ মনে হয়।

দীর্ঘদিন ধরে সীমান্ত হত্যা বন্ধ করার দাবি ছিল বাংলাদেশের এবং এরসাথে কাঁটাতার দেওয়াটাকেও তারা জুড়ে দেন। যদিও সীমান্তহত্যার সাথে কাঁটা তারের বেড়া দেওয়ার কোন সম্পর্ক নেই এবং এতে সীমান্তে বসবাসকারী যে সমস্ত ভারতীয়ের জমি বেড়ার ওপারে থাকে তাদেরই সমস্যা হয়। এটা সত্যি যে, অনেকবারই সিদ্ধান্ত হয়েছে যে বর্ডারে এমন কোন 'লেথাল ওয়েপন' ব্যবহার করা হবে না যার কারণে মানুষ মারা যেতে পারে, তবু এই মর্মান্তিক ও অমানবিক মৃত্যুর ঘটনা সীমান্তে ঘটে চলেছে। সীমান্তের তারকাঁটায় ঝুলে থাকা কিশোরী ফেলানির মৃতদেহের দৃশ্য উভয় দেশের মানুষের বিবেককেই নাড়িয়ে দিয়েছিল। ভারতের তরফে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হলেও সীমান্ত হত্যার ঘটনা সম্পূর্ণ বন্ধ হয় নি। এমন কি ৫ই অগাস্টের পরেও ত্রিপুরা সীমান্তে স্বর্ণা দাস নামে ১৩ বছরের এক কিশোরী বিএসএফের গুলিতে মারা গেছে। আমরা সকলেই জানি ফেলানি বা স্বর্ণা কেউই চোরাকারবার করতে সীমান্ত পার হতে যায় নি বা তাঁরা সশস্ত্রও ছিল না। তাহলে বিএসএফ কেন তাদের গুলি করে হত্যা করল? তবে, বিষয়টি এমন নয় যে সীমান্তে শুধুমাত্র বাংলাদেশীরা নিহত হচ্ছে। মানবাধিকার সুরক্ষা মঞ্চের (মাসুম) ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সমস্যা নিয়ে বহু বছর যাবত কাজ করছে। এই সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কিরীটি রায় ২০২২ সালে এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন যে ২০১৪ সালের পর থেকে প্রতিবছর গড়ে ২০০ মানুষের মৃত্যু হচ্ছে। এই সংখ্যাটা ২০১৪ সাল পর্যন্ত ছিল গড়ে ১৫০। কিন্তু তিনি পরিসংখ্যান উল্লেখ করে জানান এদের মধ্যে অমোটামুটি ৮০ শতাংশ ভারতীয়, ২০ শতাংশ বাংলাদেশীদ। (রায়, ২০২২) তাহলে যে সমস্ত ভারতীয় মারা যাচ্ছেন তাদের নিয়ে আমাদের এখানে প্রায় কোন আলোচনাই হয় না কেন? এই নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে খুব বেশি ক্ষোভ প্রকাশের ঘটনার উদাহরণ নেই কেন? তার কারণ হলো এখানকার সাধারণ মানুষ মনে করেন যাঁরা মারা যাচ্ছেন তাঁরা অসামাজিক কাজকর্মে জড়িত, গরু বা মাদক পাচারের সাথে যুক্ত এবং বিএসএফের ব্যবস্থাগ্রহণ সীমান্তের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার পদক্ষেপ। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এমন কথা অবশ্য কেউ সমর্থন করবেন না যে চোরাকারবারী হলেই তাকে বিনা বিচারে হত্যা করা যাবে। প্রকৃত ঘটনা হলো যে সারাক্ষণ দুই দেশের পাহারাদারদের সম্মতিতেই অর্থের বিনিময়ে চোরাচালান হচ্ছে। যদি কেউ অর্থ না দিয়ে সীমান্ত পার হতে যায় বা মাল পারাপার করতে চেষ্টা করে তখনই গুলি চলে। এরজন্য যেমন বিএসএফের কিছু অসৎ মানুষ দায়ী, তেমনি একই সাথে বাংলাদেশের বিজেবির কিছু অসৎ মানুষও দায়ী।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতা, সাংবাদিক, 'টক-শো' অ্যাক্টিভিস্টদের সমস্যা হলো তাঁরা বিএসএফের 'ট্রিগার-হ্যাপি' চরিত্র নিয়ে সর্বদা সোচ্চার, কারণ তা তাদের ভারতবিরোধী অ্যাজেন্ডার কাজে লাগে। কিন্তু তাঁরা এই সত্যটি প্রকাশ করে অপ্রিয় হতে চান

না যে বিজেবি তাদের দেশের মানুষদের চোরাকারবারে উৎসাহিত করেন এবং নিজেরা সেই কারবার থেকে অনৈতিকভাবে অর্থ উপার্জন করেন। এই কারণে সীমান্ত হত্যা নিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে ঢাকার বুদ্ধিজীবীরা দিনরাত বিষেদগার করলেও বিজেবি নিয়ে কখনো টু শধটিও তাদের মুখে শুনতে পাওয়া যায় না। আমাদের দেশের অনেকেই জানেন না যে ভারত থেকে চোরাই পথে গরু সীমান্ত পার করা বাংলাদেশের স্থানীয় প্রশাসনের জন্য রাজস্ব সংগ্রহের অন্যতম পন্থা। সেখানকার স্থানীয় প্রশাসন নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে চোরাই গরুর গায়ে সিল মেরে দেয়। সেই গরু তখন বাংলাদেশের যে কোন জায়গায় যাওয়ার জন্য বৈধ পণ্যে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এই কথা সকলেরই জানা আছে যে অবৈধ পথে গরু পাচার করতে গিয়েই অধিকাংশ সময়ে মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। বাস্তবতা হলো সীমান্তের দুইপাশেই যাঁরা বসবাস করেন তাঁরা অধিকাংশই অত্যন্ত দরিদ্র এবং স্থায়ী উপার্জনের কোন ব্যবস্থা দুই দেশের সরকারই আজ পর্যন্ত গড়ে তুলতে পারে নি। সীমান্তের মানুষের যদি সুস্থ্যভাবে বেঁচে থাকার মতো অর্থ উপার্জনের বিকল্প না থাকে তবে চোরাকারবার কি রোধ করা সম্ভব? একদল উপার্জনহীন মানুষকে চোরাকারবারের সুযোগ করে দেওয়া সীমান্তপ্রহরীদের একাংশের কাছে অতিরিক্ত অর্থ উপার্জনের আকর্ষণীয় পথ। নেপাল-ভূটানের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্যের জন্য ভারত তার স্থলপথ ব্যবহার করতে দেয় না এবং চারদেশের মধ্যে গাড়ি চলাচলের জন্য BBIN MVA (Bangladesh-Bhutan-India-Nepal Motor Vehicles Agreement) চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পরও ভারত তার দেশের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের গাড়ি যেতে দেয় না, এই দুটো বিষয় নিয়েই অসংখ্যবার অসত্য তথ্য প্রচার করা হয়েছে। এক শ্রেণির রাজনৈতিক নেতা ও বুদ্ধিজীবী, যাদের রাজনৈতিক জনসমর্থের মূল ভিত্তি হলো ভারতবিরোধিতা- দিনের পর দিনে বলে গিয়েছে ততআমরা যে শুনছিলাম চুক্তি হইসে, এইবার আমাগো গাড়ি সব ভারত, নেপাল, ভূটান সবখানে যাইতে পারব। এখন তো আমাদের দেশের মধ্য দিয়া ভারতের সব গাড়ি চলতাসে, কিন্তু ভারত তো আমাদের গাড়ি যাইতে দেয় না, আমরা তো ভূটান নেপাল যাইতে পারি না। চুক্তি ক্যান লুকায় রাখসেন, ক্যান গোপন, বাইর করেন, দেখি আর কি কি দিসেনদ ইত্যাদি। এই শ্রেণির বুদ্ধিজীবীরা কোনদিন কি তথ্য যাচাই করার চেষ্টা করেছেন? প্রকৃত তথ্য হলো প্রথম দাবি বাস্তবায়নে ভারতের আপত্তি কোনকালেই ছিল না। বরং সড়ক পথে নেপালের সাথে পণ্য পরিবহনের জন্য চ্যাংরাবান্ধা থেকে নেপালের কাঁকরভিটা পর্যন্ত এবং চ্যাংরাবান্ধা থেকে জয়গাঁ হয়ে ফুন্টসিলং পর্যন্ত ভারত চার-লেনের রাস্তা নির্মাণ করেছে। এছাড়া ভূটান থেকে পণ্য আমদানী করতে ভারত Indiaós National Waterway-2-কে করিডোর হিসাবে দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশকে ব্যবহার করতে দেয় এবং সেই পথে বাণিজ্য হয়। ভূটান থেকে সড়ক পথে প্রথমে পণ্য ধুবড়িতে আসে এবং সেখান থেকে নদীপথে (Indiaós National Waterway-২) পণ্য বাংলাদেশে যায়। উপরন্তু, ভারতের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং সড়ক পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সরকারি নথি অনুযায়ী, ভারত তার নিজস্ব অভ্যন্তরীণ যানবাহনের কাছ থেকে জাতীয় মহাসড়কে টোল আদায় করে, কিন্তু বর্তমানে বিদ্যমান ট্রানজিট চুক্তিগুলোর অধীনে বাংলাদেশ থেকে ভুটান বা নেপালে যেসব পণ্য ভারতের ভেতর দিয়ে যায়, সেগুলোর জন্য ভারত কোনো ট্রানজিট ফি বা টোল আরোপ করে না।

তেমনি, আওয়ামী লীগ নেত্রীকে ভারতের 'দাসী' প্রতিপন্ন করতে BBIN MVA SBangladesh-Bhutan-India-Nepal Motor Vehicles Agreement) চুক্তি সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য সমাজ মাধ্যমে বলা ছিল এদের অন্যতম একটি হাতিয়ার। এমন একটা অসত্য কথা কিভাবে দিনের পর দিন প্রচার করা সম্ভব তা ভাবলেই অবাক হতে হয়। বিষয়টি হলো ২০১৫ সালের ১৫ জুন তারিখে ভুটানের থিম্পুতে চারটি দেশের পরিবহন মন্ত্রীদের দ্বারা একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যাতে স্থির হয়েছিল যে এই চারটি দেশের মধ্যে যাত্রীবাহী, ব্যক্তিগত এবং পণ্যবাহী যানবাহন নির্বিঘ্নে চলাচল করতে পারবে। ভারত, নেপাল এবং বাংলাদেশ সমঝোতা পত্রটিকে আইনী অনুমোদন (ratify) দিলেও পরিবেশগত প্রভাব এবং স্থানীয় পরিবহন ব্যবসার উপর সম্ভাব্য প্রভাব নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে ভুটানের জাতীয় পরিষদ (সংসদের উচ্চকক্ষ) চুক্তিটি অনুমোদন করেনি। এই কারণে চুক্তিটি কার্যকর করা যাচ্ছিল না। কোনরকম তথ্য যাচাই না করেই তাঁরা এর মধ্যে ভারতের আধিপত্যবাদ দেখতে পান এবং উচ্চগ্রামে প্রচার করে এসেছেন।

আরো উল্লেখযোগ্য যে বাংলাদেশকে তাদের পণ্য তৃতীয় কোন দেশে রপ্তানীর জন্য ভারত বিনা পয়সায় (without transit fee) তার দেশের রাস্তা ব্যবহারের এবং কোনরকম শুল্ক ছাড়াই স্থলবন্দর, সমুদ্র বন্দর এবং বিমান বন্দর ব্যবহার করতে দিয়েছে। তাদের দেশের কাগজেই সে তথ্য আছে - "In the latest– India has offered Bangladesh free transit facilities for exports to third countries using its territory and

land– sea and airports. This means India will not impose any fee if Bangladesh exports goods to a third country using Indian ports. It is certainly positive news for us. It means India will not charge any transit fee if any Bangladeshi product heads for a third country after reaching Mumbai by road or sea. It will be good for our exports and ease of doing business outlook." (রহমান, ২০২২) উল্লেখযোগ্য যে দিল্লি বিমানবন্দরে শুধুমাত্র বাংলাদেশের পণ্য 'handling'এর সমস্ত সুবিধাসহ বিশেষ টার্মিনাল তৈরি করা হয়েছে। বাংলাদেশ বিনাশুল্কে কোনরকম চার্জ না দিয়ে এই ট্রানশিপমেন্ট সুবিধা ভোগ করে। কিন্তু চুক্তি অনুযায়ী যদি ভারত বাংলাদেশের সড়ক ব্যবহার করে তারজন্য ভারতকে কিন্তু ট্রানশিপমেন্ট চার্জ দিতে হবে এবং সেই চার্জের হার, বাংলাদেশের সংবাদ মাধ্যম যা বলে (Tk 1.85 per tonne per km), তার চেয়ে অনেক বেশি। কারণ, তারা শুধুমাত্র রোড ইউজেস চার্জ উল্লেখ করে, কিন্তু তার সাথে ট্রানশিপমেন্ট ফি, ডকুমেন্ট প্রসেসিং ফি, কনটেইনার স্ক্যানিং ফি, এসকর্ট চার্জ এবং সর্বোপরি ১৫ শতাংশ ভ্যাটের কথা তারা উল্লেখ করে না। এই হলো বাংলাদেশ শুধু 'একতরফাভাবে' ভারতকে দিয়েই গেছে, ভারতের কাছ থেকে প্রতিদানে কিছু পাওয়া যায় নি।

ভুটান ও নেপাল থেকে বাংলাদেশকে বিদ্যুৎ আমদানী করতে ভারত দিচ্ছে না বলেও তাঁরা ক্রমাগত মিথ্যা প্রচার করেছে। প্রকৃত তথ্য হলো বাংলাদেশ ভুটানের সাথে ২০১০ সালে বিদ্যুত আমদানী বিষয়ে চুক্তি করে এবং ভারতের গ্রিডের মাধ্যমে ২০১৩ সাল থেকে বিদ্যুৎ আমদানী শুরু করে। আর, নেপালের কাছ থেকে বিদ্যুৎ আনার বিষয়ে বাংলাদেশ চুক্তিই (Formal Trilateral Treaty) করেছে ৩রা অক্টোবর, ২০২৪ সালে। কিন্তু তার আগে Pilot Trading Arrangement এর ভিত্তিতে ২০২০-২১ সাল থেকেই ভারতের গ্রিড ব্যবহার করে বিদ্যুৎ আমদানী করার অনুমতি ভারত দিয়েছে। প্রাথমিক অবস্থায় ভারতের গ্রিডের ক্যাপাসিটির সঙ্গে (400 kV & above) বাংলাদেশের গ্রিড ক্যাপাসিটির (132 kV– 230 kV) পার্থক্য থাকায় কিছু কারিগরি সমস্যা ছিল। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ভারত বাংলাদেশকে নামমাত্র চার্জে সেই বিদ্যুৎ আনার সুযোগ দিয়েছে। ভারতের অভ্যন্তরীণ বিদ্যুৎ পরিবহনের জন্য ট্রান্সমিশন চার্জ সাধারণত প্রতি কিলোওয়াট ঘণ্টা (kWh) ১ থেকে৪ এরমধ্যে হয়ে থাকে। কিন্তু নেপাল থেকে ভারতের মুজাফফরপুর সাবস্টেশনের মাধ্যমে জলবিদ্যুৎ আমদানির ক্ষেত্রে, বাংলাদেশ প্রতি কিলোওয়াট-ঘণ্টা (kWh) বিদ্যুতের জন্য ভারতকে ট্রান্সমিশন চার্জ বাবদ দেয় বাংলাদেশী টাকায় মাত্র ৭৬ পয়সা। এই ট্রান্সমিশন চার্জের পাশাপাশি, বাংলাদেশ ভারতের এনটিপিসিকে প্রতি ইউনিটে বাংলাদেশী টাকায় মাত্র ৯ পয়সা ট্রেডিং মার্জিন হিসেবে প্রদান করে। ভারতীয় মুদ্রায় রূপান্তরিত করলে এ প্রায় চার্জ না নেওয়ার সমান। এইসব দেখে কি মনে হচ্ছে, ভারত সব 'একতরফাভাবে' সুবিধা নিয়েছে?

আদানীর বিদ্যুৎ নিয়েও তাদের বিস্তর অভিযোগ ছিল। ভারতের আধিপত্যবাদের জন্যই নাকি অস্বাভাবিক মূল্যে আদানী থেকে বিদ্যুৎ কিনতে বাংলাদেশকে বাধ্য করা হয়েছে এবং কোটি কোটি টাকা ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। মোদী সরকার আদানীকে গোড্ডার পাওয়ার প্ল্যান্টে যে অনৈতিক সুবিধা দিয়েছে তা নিয়ে আমাদের দেশে প্রবল সমালোচনা আছে, কিন্তু তার সাথে বাংলাদেশের স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার কোন সম্পর্ক নেই। বরং ভারতের ক্ষতি করেই বাংলাদেশকে বিদ্যুতের সুবিধা দেওয়া হয়েছে। এই কারণে আদানীর সাথে বিদ্যুৎ চুক্তি নিয়ে এত হুংকার শোনার পরও অন্তর্বর্তী সরকার সেই চুক্তি বাতিল করার কথা আর এখন বলছে না। মোদি সরকার ঝাড়খণ্ডের গোড্ডার তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রকে 'বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল' (SEZ) হিসেবে ঘোষণা করেছে, যা ভারতের বিদ্যুৎখাতে প্রথম দৃষ্টান্ত। এই কারণে আদানীর কোম্পানি রপ্তানি ও আমদানি শুল্কে ছাড়, ক্লিন এনার্জি সেস থেকে অব্যাহতি, আয়কর না দেওয়ার সুবিধা ইত্যাদি পেয়েছে। নিয়ন্ত্রক ও পরিচালন সংক্রান্ত নিয়মের শিথিল করা হয়েছে, যে কারণে আদান্নি উৎপাদিত বিদ্যুতের কোন অংশ স্থানীয় গ্রিডে সরবরাহ করার বাধ্যবাধকতা নেই। তাহলে বিষয়টি কি দাঁড়াল? প্লান্ট ও রাস্তা তৈরির জন্য জমি আমাদের, সেগুলো তৈরি করতে গিয়ে গাছ কাটা পড়ার জন্য ক্ষতি আমাদের, কয়লাভিত্তিক হওয়ার কারণে ভয়ঙ্কর পরিবেশ দূষণ তাও আমাদের, বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য যে প্রচুর জলের প্রয়োজন হয় তা সরবরাহ করতে গিয়ে স্থানীয় মানুষের জলের কষ্ট সেও আমাদের, কিন্তু উৎপাদিত বিদ্যুৎ বাংলাদেশের। এমন কি নিয়ম অনুযায়ী স্থানীয় রাজ্যের মানুষের বিদ্যুতের যে অংশ পাওয়ার কথা তাও বাংলাদেশের। আমদানী শুল্ক, রপ্তানী শুল্ক, আয়কর, সেস, জিএসটি বাবদ যে রাজস্ব দেশের মানুষের পাওয়ার কথা তাও নেই। ফলে ভারতের সাধারণ মানুষ এই প্লান্ট থেকে পাচ্ছে কি , জমির ক্ষতি, জলের ক্ষতি, দূষণের ক্ষতি, রাজস্বের ক্ষতি। এতসব ক্ষতি স্বীকার করেও বিদ্যুৎ যাচ্ছে কোথায় ,

বাংলাদেশে।

বাংলাদেশের পক্ষে কি এই প্রকল্প খুব অলাভজনক হয়েছে? তাদের দেশের অন্যান্য সংস্থার উৎপাদিত বিদ্যুতের ব্যয় সম্পর্কে এই বছরের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত প্রতিবেদনের তথ্য উল্লেখযোগ্য। সেখানে বলা হয়েছে ,ত গত অর্থবছরে গ্যাস থেকে প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদনে খরচ ছিল ৬.৩১ টাকা, কয়লা থেকে প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদনে খরচ হয়েছিল ১২.৭৪ টাকা। অন্যদিকে, ফার্নেস অয়েল থেকে প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদনে খরচ হয়েছিল ২৫.৭০ টাকা। '(হোসেন, ২০২৫) অর্থাৎ, রামপাল, পায়রা, মাতারবাড়ি এবং বরিশালে যে আমদানী করা কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র আছে সেখানে উৎপাদন ব্যয় প্রতি ইউনিটে ১২.৭৪ টাকা। ২০২৪ সালের অগাস্ট মাসেই বাংলাদেশের পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে উল্লেখ করা হয়েছে - 'গত ১২ মাসের গড় বিদ্যুৎ মূল্যের তথ্য 'মেরিট অর্ডার ডিসপ্যাচ ডেটা'-র ভিত্তিতে গণনা করলে গত ১২ মাসে আদানি পাওয়ারের সরবরাহকৃত বিদ্যুতের গড় প্রতি ইউনিট মূল্য ছিল ১১.৮৯ টাকা। এসময় মাতারবাড়ি বিদ্যুৎকেন্দ্রের গড় মূল্য ছিল ১৩.৩৬ টাকা, পায়রার ছিল ১২.০০ টাকা এবং রামপালের ছিল ১৩.৫৭ টাকা প্রতি ইউনিট।' (ফাইন্যান্সিয়াল, ২০২৪) গ্লোবাল এনার্জি মনিটরের ২০২৫ সালের এপ্রিল মাসের প্রতিবেদন অনুসারে এমন কি নিজেদের দেশের কয়লা ব্যবহার করে বড়পুকুরিয়া বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রথম দুটি ইউনিট থেকে উৎপাদিত প্রতি কিলোওয়াট ঘন্টা (kwv) বিদ্যুতের শুধুমাত্র জ্বালানি খরচ ছিল ১২.৩০ টাকা/কিলোওয়াট ঘন্টা। BPDB-র ২০২২-২৩ সালের বার্ষিক রিপোর্টে এই দুই ইউনিটের গড় উৎপাদন ব্যয় বলা হয়েছিল ১১.৫১ টাকা। (অ্যানুয়াল রিপোর্ট, ২০২২-২৩, পৃ-১২০) এইজন্যই আদানীর বিরুদ্ধে গরম গরম কথা বললেও এই মুহূর্তে আদানীর থেকে বিদ্যুৎ আমদানী করা তাদের পক্ষে লোকসান তো নয়ই, এমন কি বন্ধ করাও কোন অভিপ্রেত বিকল্প নয়। এই সমস্ত তথ্য নিজেদের দেশের পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও তাদের রাজনৈতিক বয়ান কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন ও ভারতবিরোধী হতে বাঁধা হয় নি।

ভারতের সাথে সুসম্পর্কের কারণে বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে লাভজনক হয়েছে এমন আর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প আছে যার কথা ভারতবিরোধীরা কখনো উল্লেখই করে না। সেটি হলো পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়ির নুমালিগড় রিফাইনারি লিমিটেড (NRL) টার্মিনাল থেকে দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুরে অবস্থিত বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (BPC)-এর ডিপো পর্যন্ত পাইপলাইন (IBFPL) নির্মাণ, যার কার্যক্রম শুরু হয়েছে ২০২৩ সালের মার্চ মাসে। এই পাইপলাইনের মোট দৈর্ঘ্য আনুমানিক ১৩১.৫ কিলোমিটার, যার মধ্যে ৫ কিমি ভারতের অংশে এবং বাকি ১২৬.৫ কিমি বাংলাদেশের মধ্যে অবস্থিত। এর বার্ষিক পরিবহণ ক্ষমতা ১০ লাখ মেট্রিক টন হাই-স্পিড ডিজেল (HSD)। পুরো প্রকল্পের মোট খরচ প্রায় ৩৭৭ কোটি টাকা, যার মধ্যে বাংলাদেশের অংশের পাইপ লাইন নির্মাণের খরচ ছিল প্রায় ২৮৫ কোটি টাকা ; যা সম্পূর্ণ ভারত সরকারের অনুদানে নির্মিত হয়েছে। অর্থাৎ, বাংলাদেশ নিজস্ব বাজেট থেকে একটি টাকাও খরচ না করেই ১২৬.৫ কিলোমিটার দীর্ঘ পাইপলাইন সুবিধা পেয়েছে। এই পাইপলাইন বর্তমানে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের সাতটি জেলায় ডিজেল সরবরাহ করছে, যা জ্বালানি নিরাপত্তা বৃদ্ধির পাশাপাশি কৃষি ও টেক্সটাইল খাতসহ বিভিন্ন খাতে সহায়তা করছে। এই প্রকল্পের অন্যতম কৌশলগত তাৎপর্য হল এর ব্যয়সাশ্রয়ী চরিত্র; আগের রেলভিত্তিক আমদানির তুলনায় পরিবহন ব্যয় প্রতি ব্যারেলে প্রায় ২ ডলার কমে গেছে। এছাড়াও, এই প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব ইতিবাচক, কারণ এটি সড়ক ও রেল পরিবহনের পরিবর্তে পাইপলাইনের মাধ্যমে ডিজেল সরবরাহ করে কার্বন নির্গমন কমাতে সহায়তা করছে।

বাংলাদেশ ভারতের প্রতিবেশী এবং সুদীর্ঘকাল ধরে একই ইতিহাস ও সংস্কৃতির অংশীদার। দুই প্রতিবেশীর মধ্যে নানা দাবি-দাওয়া থাকে, তা নিয়ে সমস্যা থাকে, পারস্পরিক সম্পর্কের জটিলতা তৈরি হয়। বাংলাদেশের কোন দাবিই কখনো ভারত মানে নি তাও এক মিথ্যা প্রচার। বাংলাদেশের সাথে ভারতের সম্পর্কের একটি সমস্যা মিটলে বা একটি দাবির মীমাংসা হলে, নতুন সমস্যা নতুন দাবি এসে উপস্থিত হয়েছে। সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মধ্যে যা খুব অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু, স্বার্থান্বেষী মহলের ভারতবিরোধী প্রচারের ঢক্কানিনাদে পুরনো সমস্যার যে সমাধান হয়েছিল তা আর কারোর স্মরণে থাকে না। যেমন, ছিটমহল বিনিময়। এটা তো একটা বড় সমস্যা ছিল। তার মীমাংসা হয়েছে এবং ভারত প্রায় ১০ হাজার একর জমি হারিয়েছে। অর্থাৎ ভারত রাষ্ট্রের আয়তন কমেছে, বাংলাদেশের আয়তন বেড়েছে। বিভিন্ন দেশের মধ্যে যুদ্ধ হয় এক ইঞ্চি জমি নিয়ে, মহাভারতের যুদ্ধ হয়েছিল সূচ্যগ্র মেদিনী না দিতে চাওয়া নিয়ে। কিন্তু প্রতিবেশী রাষ্ট্রের কাছে ১০ হাজার একর জমি হারানোর প্রশ্নে ভারতের পার্লামেন্টে একজন সদস্যও বিরোধিতা করেননি। সমুদ্রসীমা নিয়ে যে সমস্যা ছিল সে সম্পর্কে ভারতের অবস্থান সুপ্রতিবেশীসুলভ

মনোভাবেরই পরিচয়। আন্তর্জাতিক arbitration অনুযায়ী বিতর্কিত অঞ্চলের দুই-তৃতীয়াংশই পেয়েছে বাংলাদেশ, কিন্তু ভারত তা খুশি মনেই মেনে নিয়েছে। এমন কি সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আপিল করে নি। তারপর, তিনবিঘা করিডোর দেওয়ার চুক্তি দীর্ঘকাল ধরে অকার্যকর হয়ে পড়ে ছিল। আইনি জটিলতায় এবং ভারতের সুপ্রিম কোর্টে মোকদ্দমার কারণে অনেক বছর লেগেছে ঠিকই, তবে সেই সমস্যারও সমাধান হয়েছে। স্থানীয় অঞ্চলের মানুষের প্রতিবাদ আন্দোলন, পুলিশের গুলিতে প্রতিবাদীর মৃত্যু ইত্যাদি সত্ত্বেও বর্তমানে যাতায়াতের জন্য ২৪ ঘন্টা করিডোর বাংলাদেশীদের দেওয়া হয়েছে।

ভারত বাংলাদেশের সকল পণ্যকে কোনরকম শুল্ক ছাড়াই ভারতে রপ্তানী করার সুযোগ দিয়েছে। এখন বাংলাদেশের ভারতবিরোধী রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীরা কোনরকম প্রমাণ উপস্থিত না করেই অভিযোগ করেন যে ভারত নাকি 'nontariff barrier' সৃষ্টি করে তাদের পণ্য ভারতে আসতে দেয় না। WTO হওয়ার পর যদি কোন দেশ nontariff barrier'-এর মতো কিছু করে তবে WTO-এর কাছে অভিযোগ দায়ের করা যায়। এই সম্পর্কিত একটাও অভিযোগ বাংলাদেশ WTO-এর কাছে আজ পর্যন্ত তুলেছে বলে আমি খুঁজে পাই নি। সুসম্পর্কের কারণে বাংলাদেশ ভারতের সহায়তা পেয়েছে এমন উদাহরণ আরো আছে। ২০২০ সালের জুলাই মাসে ভারত অনুদান সহায়তার আওতায় বাংলাদেশকে ১০টি ব্রডগেজ এবং ২০২৩ সালের ২৩ মে ২০টি ডিজেল লোকোমোটিভ (WDM-3D শ্রেণি) ইঞ্জিন উপহার দেয়। সরকারি সূত্র অনুযায়ী, ২০২০ সালে যখন এই ১০টি লোকোমোটিভ উপহার দেওয়া হয়, তখন উল্লেখ করা হয়েছিল যে সবগুলো লোকোমোটিভ মিলিয়ে এগুলির নির্মাণ ব্যয় ছিল প্রায় ৬০০ মিলিয়ন টাকা (প্রায় ৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)। ভারত ২০১৭ সালের ৫ মে 'দক্ষিণ এশিয়া স্যাটেলাইট' (GSAT-9) নামে একটি স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করে এবং জিওস্টেশনারি অরবিটে (GSO) স্থাপন করে। টেলি-শিক্ষা, টেলি-চিকিৎসা, সম্প্রচার, ভি-স্যাট ইত্যাদি যোগাযোগ ও সম্প্রচার সুবিধা, আবহাওয়া সম্পর্কিত তথ্য, পরিবেশ পর্যবেক্ষণ, মানচিত্রায়ন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সহায়তা ইত্যাদি কাজে প্রতিবেশী দেশ হিসাবে বাংলাদেশ বিনামূল্যে এই স্যাটেলাইটের ব্যান্ড-উইথ ব্যবহার করার সুযোগ নিয়ে আসছে। এই সবই হয়েছে মাননীয় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শাসনামলে।

সারা বিশ্বে জনমত গঠন করতে ইন্দিরা গান্ধী সহ অন্যান্য রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক আধিকারিকরা দৌড়-ঝাপ করতে যে সময় ও অর্থ ব্যয় করেছিল, মূল্যবান অস্ত্র, গোলা-বারুদ দিয়েছিল, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দিতে বিপুল অংকের অর্থ খরচ করেছিল, দশমাস ধরে ১ কোটি শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়ে তাদের খাদ্য, চিকিৎসা ও অন্যান্য মানবিক সহায়তার খাতে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করেছিল

এমন অনেক উদাহরণ দেওয়া যাবে। এই কয়েকটি উদাহরণ দেখেই কি ৫ই অগাস্টের পর 'প্রথম আলো'-য় প্রকাশিত সেই বাংলাদেশী বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীর কথা সর্বৈব সত্য মনে হয় যে ভারত তএকতরফাভাবেদ কেবল সুবিধা নিয়েছে, নাকি সেটা পরিকল্পিতভাবে ভারত বিরোধী প্রপাগান্ডার অংশ মনে হয়?

বাংলাদেশের রাজনীতিতে কখনোই ভারত বিরোধিতার অবসান হবে না

আমার মত হলো ভারতের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের ক্ষোভের এবং বঞ্চনার অভিযোগের শেষ কোনদিন হবে না। তার অন্যতম কারণ হলো বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস ও ঐতিহ্যের মধ্যেই তার উৎস লুকিয়ে আছে। শুধুমাত্র ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ সৃষ্টির পরই নয়, ১৯৪৭ সাল থেকেই তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানেও ভারত বিরোধিতা ছিল রাজনীতির অংশ। যখনই পাকিস্তান আমলে সরকারের বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন হয়েছে তখনই সেই আন্দোলনের বিরুদ্ধে মানুষের সমর্থন আদায় করতে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার ভারতের ষড়যন্ত্রের কথা বলেছে। শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা যেমন অন্যতম উদাহরণ। ১৯৭১ পরবর্তীকালে জন্মলগ্ন থেকেই ভারত বিরোধিতার গল্প বাংলাদেশের রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। ভারত যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতা করেছিল, সারা বিশ্বে জনমত গঠন করতে ইন্দিরা গান্ধী সহ অন্যান্য রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক আধিকারিকরা দৌড়-ঝাপ করতে যে সময় ও অর্থ ব্যয় করেছিল, মূল্যবান অস্ত্র, গোলা-বারুদ দিয়েছিল, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দিতে বিপুল অংকের অর্থ খরচ করেছিল, দশমাস ধরে ১ কোটি শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়ে তাদের খাদ্য, চিকিৎসা ও অন্যান্য মানবিক সহায়তার খাতে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করেছিল এবং সর্বোপরি কয়েক হাজার

ভারতীয় সৈন্য লড়াইতে প্রাণ দিয়েছিল , সেইসবই তুচ্ছ। বরং স্বাধীনতার পর থেকেই একদল প্রচার করার চেষ্টা করেছে এবং আজও করছে যে ভারতীয় সৈন্যরা আসলে সেখান থেকে নাকি সব লুটপাট করতেই গিয়েছিল। একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি , জাফরউল্লা চৌধুরীকে - বহুবার স্মৃতিচারণে বলতে শুনেছি যে পাকিস্তানী সৈন্যদের আত্মসমর্পনের পর তিনি দেখেছেন পাকিস্তানী অফিসার্স মেস থেকে একজন ভারতীয় সৈন্যকে টিভি খুলে নিয়ে যেতে। যদি এই ঘটনা সত্যও ধরে নেই তবু এত যে বলিদান, ট্রেনিং ও সামরিক সরঞ্জামের পেছনে এত অর্থ ব্যয়, ভারত সরকারের পাশাপাশি অসংখ্য সাধারণ ভারতীয়ের এত আন্তরিকতার সাথে পরদেশীর বিপদে নিজের শেষ সম্বল দিয়ে আশ্রয়দান সব মিথ্যা কেবল ঐ একটা টিভির জন্য। এমন গল্পও খুব প্রচলিত আছে যে জহির রায়হান নাকি ভারতীয় সৈন্যদের বাংলাদেশের সম্পদ লুট করার চিত্র ধারণ করেছিলেন এবং সেই প্রমাণ লোপাট করতেই নাকি তাকে গুমের শিকার হতে হয়েছে। বাংলাদেশের একদল মানুষ এইসব প্রচার করে যে খুব আনন্দ পান, উৎফুল্ল হন তার মধ্যেই প্রথমাবধি ভারত বিরোধিতার মানসিকতা লক্ষণ সুস্পষ্ট হয় এবং তাঁরাই এইসব ঘটনাকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয়দের অংশগ্রহণের চরিত্র-চিত্রণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক উপাদান বলে মনে করেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে ১৯৭৫ সালের ১৫ই অগাস্ট সামরিক বাহিনী সপরিবারে হত্যা করার কয়েকদিন পর ৩-রা নভেম্বর মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম কমান্ডার খালেদ মোশারফ ক্ষমতায় আসেন। এই সময় মেজর আবু তাহের এবং তাঁর নেতৃত্বাধীন 'জাসদ'-এর সদস্যরা প্রচার করেন যে মোশারফ ভারতের দালাল। এই অভিযোগ দুর্দান্ত কাজ দেয়, মেজর আবু তাহেরের নেতৃত্বে সাধারণ সৈন্যরা মোশারফকে হত্যা করলে জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় আসে। জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসেই প্রতিদ্বন্দ্বী তাহেরকে ভারতের দালাল বলে প্রচার করে এবং গ্রেপ্তার করে ফাঁসিতে ঝোলায়। মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সেনানায়ক মেজর জলিল তার বিভিন্ন সাক্ষাৎকার ও লেখায় দাবি করেন, মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল এম.এ.জি. ওসমানী তাকে একবার বলেছিলেন 'মুজিব ভারতের সঙ্গে ২৫ বছরের গোলামির চুক্তি করে ফেলেছে।' বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমানের

> ভারতীয় রাষ্ট্র ও পুঁজি আপেক্ষিক অর্থে অধিকতর শক্তিশালী হওয়ার কারণে তার কর্তৃত্ববাদী আচরণ বন্ধ হবে না এবং এই কারণে ভারত-বিরোধী রাজনীতির তত্ত্ব ও দর্শনের অস্তিত্বের যে বাস্তবতা তারও অবসান ঘটবে না। এখন মহম্মদ ইউনূসও তাঁর ক্ষমতাকাল দীর্ঘায়িত করার জন্য সেই ভারত বিরোধিতার অস্ত্রকেই একইভাবে কাজে লাগাচ্ছেন এবং অভিযোগ করছেন তিনি নাকি ভারতের আধিপত্যবাদের জন্য সংস্কারের কাজ করতে পারছেন না।

বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে ক্ষেপিয়ে তুলতে ভারতের সঙ্গে গোলামী চুক্তির এই গল্প খুব কাজে দিয়েছিল। ভারতের কাছে দাসখত লিখে দেওয়ার এমন অনেক গল্প প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিনের নামেও প্রচলিত আছে। আবার জিয়াউর রহমান সেনাপ্রধান হিসাবে ক্ষমতা নেওয়ার সাথে সাথেই ইচ্ছাকৃতভাবেই এমন গুজব রটানো হয়েছিল যে ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশ আক্রমণ করতে বর্ডার পার হচ্ছে। ব্যস, জিয়াউর রহমানকে নিজের ক্ষমতা পাকাপোক্ত করতে এবং তাঁর সকল বিরোধী ও প্রতিদ্বন্দ্বীদের নিকেশ করতে আর কিছুর প্রয়োজন হয় নি। কেন বাংলাদেশের রাজনীতিতে শাসক দলের যে কোন কুকর্ম সাধন করতে বা কোন কুকর্মের অভিসন্ধি আড়াল করতে এই ভারত বিরোধিতা টনিকের মতো কাজ করে?

বাংলাদেশ যখন মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন হয়, তখন এই স্বাধীনতা যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে সমগ্র দেশ ঐকমত্য ছিল না। মুক্তিযুদ্ধ শুরুর ঠিক আগে যে নির্বাচন হয়, যেখানে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ মেজরিটি পায়, সেই নির্বাচন ছিল ৬ দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে। সেই দাবির মধ্যে স্বাধীনতার আকাঙ্খার বীজ ছিল, কিন্তু পশ্চিম-পাকিস্তান থেকে বিযুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের কথা ছিল না। কিন্তু সেই স্বায়ত্তশাসনের দাবির বিরুদ্ধেও তো আর একদল মানুষ মুসলিম লীগের ব্যানারে নির্বাচনে লড়াই করেছিল। হেরে গেলেও তো প্রায় ৩০ শতাংশের মতো ভোট আওয়ালী লীগের স্বায়ত্ত্বশাসনের দাবীর বিরুদ্ধে ছিল। যখন মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল তখনও এরাই আল-বদর, আল-সামস, জামায়েত ইসলাম ইত্যাদির নামে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছে। তাঁরা রাজনৈতিক আদর্শ ও বিশ্বাস থেকে দুই পাকিস্তান একসাথে থাকতে চেয়েছে। তাদের রাজনৈতিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী ঐ মুক্তিযুদ্ধ আসলে পাকিস্তানকে বিভক্ত করার জন্য ভারতের ষড়যন্ত্র এবং অপকৌশল। এমন কি আওয়ামী লীগের মধ্যেও যুক্ত- পাকিস্তানের সমর্থন করে এমন

ভাবনার লোক ছিল, যেমন অস্থায়ী মন্ত্রীসভার পররাষ্ট্র মন্ত্রী খন্দকার মোস্তাক। সে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়েই কনফেডারেশন নিয়ে পাকিস্তানের সাথে গোপনে আলোচনা চালিয়েছে। আবার, স্বাধীনতার পরে এই ব্যক্তিই মুজিব হত্যার ষড়যন্ত্রের সাথে যুক্ত ছিল। আবার, মুজিব হত্যার পরে সামরিক ছাউনিতে বি-এন-পি নামে যে দলটি জেনারেল জিয়া তৈরি করেছিলেন, তাঁর দল তৈরির যৌক্তিকতাই (rationality) দাঁড়িয়ে ছিল বিশেষভাবে ভারত বিরোধিতার উপর। তাহলে এই মতানুসারী মানুষদের যে রাজনৈতিক দর্শন তা বাংলাদেশ থেকে কোনকালেই সম্পূর্ণভাবে মুছে যাবে না। আবার ভারতীয় রাষ্ট্র ও পুঁজি আপেক্ষিক অর্থে অধিকতর শক্তিশালী হওয়ার কারণে তার কর্তৃত্ববাদী আচরণ বন্ধ হবে না এবং এই কারণে ভারত-বিরোধী রাজনীতির তত্ত্ব ও দর্শনের অস্তিত্বের যে বাস্তবতা তারও অবসান ঘটবে না। এখন মহম্মদ ইউনূসও তাঁর ক্ষমতাকাল দীর্ঘায়িত করার জন্য সেই ভারতবিরোধিতার অস্ত্রকেই একইভাবে কাজে লাগাচ্ছেন এবং অভিযোগ করছেন তিনি নাকি ভারতের আধিপত্যবাদের জন্য সংস্কারের কাজ করতে পারছেন না।

বাংলাদেশের বামপন্থী ও প্রগতিশীল অংশের মানুষের ভারত বিরোধিতা অবশ্য সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অংশ। সেই বিরোধিতা শুধু একক ভাবে ভারতীয় পুঁজির আগ্রাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে নয়- তা একই সাথে অন্য যে কোন সাম্রাজ্যবাদী দেশ , আমেরিকা, জাপান, চিন, বৃটিশ সবার বিরুদ্ধেই। কিন্তু, দুর্ভাগ্যজনকভাবে তাঁরা তাদের লড়াইয়ের সেই পৃথক চরিত্র বা পার্থক্য সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। কারণ, তাদের বক্তব্য, শ্লোগান ও অন্যান্য কর্মসূচির মধ্যে জামাত, হেফাজতে ইসলাম, শিবির, বি-এন-পির তোলা বক্তব্য ও শ্লোগানের সাথে কোন পার্থক্য থাকে না। বি-এন-পি বা অন্যান্যদের মধ্যে খুব স্বাভাবিকভাবেই সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কোন কথা থাকার কথা না, বরং অনেক সময়েই এইসব শক্তি বি-এন-পি ও ইসলামপন্থী শক্তিগুলোকে তাদের সহায়ক হিসাবে ব্যবহার করে এবং ভারতবিদ্বেষী রাজনৈতিক ভাষ্য তাদের পক্ষে সনসমর্থন আদায়ে কাজে লাগে। সব পক্ষের কর্মসূচিতেই যখন 'দিল্লি না ঢাকা , ঢাকা, ঢাকা' আওয়াজ উঠতে থাকে, তখন রাজনৈতিক দর্শনের মর্মবস্তু ও উদ্দেশ্যের অভিমুখের পার্থক্যও ঢাকা পড়ে যায়। জন সমর্থন আদায়ে কে কত ভারতবিরোধী তার প্রতিযোগিতায় জয়লাভই মুখ্য হয়ে ওঠে। ❐

তথ্যসূত্রঃ

Annual Report S2022éôé23V– òGeneration Cost of BPDBós Own Power Plant For FY 2022éôé2023ó– BPDB– Bangladesh

Financial Express S2024V– òAdani Says it Supplies Electricity to Bangladesh at Cheapest Rateó– 30 April– 2024

Global Times S2021V– World / Africa–US wages global color revolutions to topple govt for the sake of American control True Colors Of Democracy– Published Dec 02– 2021

Hossain Emran (2025)– Use of oiléôébased plants to keep power cost high– New Age– 07 April– 2025

Kabir FHM Humayan S2022V– òIndiaós $7.862b line of credit Only $1.5b from LoC unlocked so faró– The Financial Express– Bangladesh– 6 September– 2022

Mala Doulot Akter S2023V–ó Transit– transshipment of goods BD opens seaports to India on permanent arrangementó– The Financial Express– Bangladesh– April 26– 2023

Rahman Mustafizur S2022V– òBusinesses build hopes on Indiaós òfree transitó offeró– The Business Standard– 08 September– 2022

Rubin Michael S2025V òIs Bangladesh the next AfghanistanÚó. The American Enterprise Institute– Washington Examiner– March 18– 2025

আহমেদ সাঈদ ইফতেখার (২০২৪), ''শেখ হাসিনা সরকারের পতন ১, গণঅভ্যুত্থান, প্রতিক্রিয়াশীল বিপ্লব, নাকি বিপ্লব' , bdnews24.com– Published 17 Dec 2024

নিশাত আইনুন নাহার (২০২৪), 'বৃষ্টির ব্যাপারে জানতো আবহাওয়া অধিদপ্তর, কিন্তু তারা সতর্ক করেনি', বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, ২৩শে আগাস্ট

মোস্তফা কল্লোল (২০২৪), 'ফেলানী খাতুন থেকে স্বর্ণা দাস সীমান্ত হত্যার শেষ কোথায়', প্রথম আলো, ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪; তালুকদার রুমী (২০২৫), 'ভারতের এক তরফা সীমান্ত হত্যা রুখতে হবে', দৈনিক পাঞ্জেরী, ৮ জানুয়ারি, ২০২৫ (লক্ষণীয় যে দুইজন দুই ভিন্ন কাগজে দুই ভিন্ন তারিখে ভিন্ন ভিন্ন প্রবন্ধ লিখলেও ভারতকে তএকতরফাদ সুযোগ দেওয়ার অভিযোগের বয়ান একদম হুবহু এক।)

রায় কিরীটি (২০২২), 'বিশেষ সাক্ষাৎকার মানবাধিকারকর্মী কিরীটি রায়', প্রথম আলো, ১৩ আগস্ট ২০২২।

নভেম্বর বিপ্লবের তোপধ্বনি কাঁপাল নতুন করে, নতুন ভাবে

দিলীপ চক্রবর্তী

১৮৭১ সালে বিশ্ব ইতিহাসে প্রথম শ্রমিকদের তৈরী 'প্যারী কমিউন' । কিন্তু এই কমিউন টিকে ছিল মাত্র তিন মাস। এর ৪৬ বছর পরে ১৯১৭ সালের ৭ নভেম্বর সাবেক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ২৫ অক্টোবর শ্রমজীবী মানুষ, বিপ্লবী সৈনিক, মধ্যবিত্ত, কৃষক শ্রমিদের নেতৃত্বে সংগঠিত হয় রুশ বিপ্লব। এই বিপ্লবকে স্বাগত জানিয়ে পরবর্তীকালে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ 'বেঙ্গলি পত্রিকায়' লিখেছিলেন 'মুষ্টিমেয় ধনিকের উপর লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের ক্ষমতা বিস্তারের অপর নাম বলশেভিকবাদ। এতকাল শ্বেত জাতিরা অপরকে বঞ্চিত করে ধন ও শক্তি অর্জন করে এসেছে। আজ প্রায়শ্চিত্তের কাল এল। এই প্রায়শ্চিত্তের বিধান আসছে বলশেভিকজম এর মধ্যে দিয়ে' (বেঙ্গলি ১৫ই আগস্ট, ১৯১৯)। ১৯১৭ সালে অরোরার তপোধ্বনি যেমন বিশ্ব পুঁজিবাদকে আতঙ্কিত করেছিল তেমনি অনুপ্রাণিত করেছে সারা দুনিয়ার শ্রমজীবী মানুষ, সংগ্রামী মানুষ এবং উপনিবেশিকবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে। রুশ বিপ্লবকে ধ্বংস করার জন্য ইউরোপের কয়েকটি ধনবাদী দেশ সেই দেশের প্রতিবিপ্লবকে মদত দেওয়া শুরু করে। অর্থনৈতিক অবরোধ সৃষ্টি করে। ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লব সংগঠিত হওয়ার সময়ে জীবন গিয়ে ছিল ১৯ জনের কিন্তু পরবর্তীকালে রুশ বিপ্লব রক্ষায় জীবন দিতে হয়েছে কয়েক সহস্র মানুষকে। রুশ বিপ্লব সংগঠিত হওয়ার পর সাম্রাজ্যবাদ ও ধনবাদী শক্তি বিপ্লব প্রসঙ্গে জঘন্য কুৎসা প্রচার করে গণতান্ত্রিক মানুষ এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সমর্থক নেতা ও কর্মীদের আতঙ্কিত করার চেষ্টা করে। আবার জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের নেতৃবর্গ এবং গণতান্ত্রিক মানুষ এই বিপ্লব সম্পর্কে সজাগ হয়ে এর পক্ষে সচেতনতা বাড়ান, একে স্বাগত জানান। আমাদের ভারতবর্ষেও এই প্রচেষ্টা আমরা দেখেছি।

'রুশ ভল্লুক' ও ভারতের সংবাদপত্র

সাংবাদিক রণমিত্র সেনের একটি চমৎকার লেখা আছে 'অরোরার সে তোপধ্বনি ভারতে এসে পৌছেছিল', এই শিরোনামে। বিপ্লবের পর ভারতে ব্রিটিশ শাসকদের সমর্থক পাইওনিয়ার কাগজে লিখল 'ইংরাজরা তো ভারত ছেড়ে চলে যেতেই চায়। কিন্তু ইংরাজরা চলে গেলেই তো রুশ বলশেভিক ভল্লুকটা ভারতের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে বলে তারা যেতে পারছে না'। ওই সময় রুশ বিপ্লব সম্পর্কে বিস্তারিত সঠিক তথ্য ও সংবাদ ভারতবর্ষে পাওয়া অসুবিধাজনক ছিল। কিন্তু এরই মধ্যে ভারতের বিভিন্ন সংবাদপত্র ও জাতীয় নেতৃবর্গ সঠিক তথ্য অনুসন্ধান করে তাদের মতামত ব্যক্ত করেছেন।

১৯১৯ সালের ১৬ই জুলাই অপর জাতীয়তাবাদী পত্রিকা 'নায়ক' এ লেখা হয়েছিল 'আমেরিকা, ইংল্যান্ড, ফ্রান্সের পুরানো ব্যবস্থা বজায় রাখার সব উদ্যম ব্যর্থ হতে বাধ্য। নতুন যুগের সুচনা হচ্ছে সোভিয়েত রাশিয়ায়। এই নতুন মতবাদ ভারতের দ্বারে করাঘাত করছে, এই মতবাদও বর্তমান সাবেকি ব্যবস্থাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করবে। 'ইংরেজরা ভারত ছেড়ে চলে গেলেই রুশ বলশেভিক ভল্লুক ভারতে ঝাপিয়ে পড়বে। ধর্ম রসাতলে যাবে' এর জবাবে গান্ধীজী ১৯২০ সালের ২৭শে মার্চ ইয়ং ইন্ডিয়া কাগজে লিখলেন 'ভারতের উপর সোভিয়েত ইউনিয়নের কোনও আক্রমণাত্মক অভিসন্ধি আছে তা বিশ্বাস করি না'। আর হরিজন পত্রিকা লিখল 'যে বিপ্লবের পিছনে আছে অসংখ্য বিপ্লবীর আত্মত্যাগ, যে বিপ্লবের সামনে আছে লেনিনের মত মহান মানুষের আদর্শ সেই বলশেভিক বিপ্লবের শিক্ষা কখনও ব্যর্থ হতে পারে না'। ১৯২৭ সালে পিতা মতিলাল , বোন কৃষ্ণা, স্ত্রী কমলা ও শিশু কন্যা ইন্দিরাকে নিয়ে রুশ বিপ্লবের ১০ম বর্ষে জওহরলাল রাশিয়া যান। রাশিয়ায় সোভিয়েত ব্যবস্থায় তিনি মুগ্ধ হন। তাঁর লেখা, কথা ও কাজে এটি প্রতিফলিত হয়। বিভিন্ন সভায় তিনি সোভিয়েত সমাজ ব্যবস্থার পক্ষে জোড়ালো বক্তব্য রাখেন। ব্রিটিশ সংবাদপত্র, এমনকি কংগ্রেসের অভ্যন্তরেও তাকে 'ছদ্মবেশী কমিউনিস্ট' বা 'প্রচ্ছন্ন কমিউনিস্ট' বলে আখ্যা দেওয়া শুরু হয়। নেহেরু কন্যা ইন্দিরার জন্ম ১৯১৭ সালের নভেম্বরে। তিনি আজীবন নভেম্বর বিপ্লবের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। জীবনাবসানের আগেও তিনি মজা করে বলেছেন, 'নভেম্বর বিপ্লব আর আমি সমবয়স্ক'। ইন্দিরার যখন ১৩ বছর বয়স, সেই সময় জওহরলাল জেলে। নাইনি জেল থেকে জওহরলাল তাঁর কন্যা ইন্দিরাকে তাঁর জন্মদিনে চিঠিতে লিখেছিলেন ১৯১৭ সাল, যে সালে তোমার জন্ম সেই সময় রাশিয়ায় একজন যুগ প্রবর্তক তাঁর কাজ আরম্ভ করেছিলেন। দুঃস্থ এবং দরিদ্রের জন্য তাঁর

হৃদয় প্রেমে করুনায় উচ্ছসিত ছিল। ঠিক যে মাসে তোমার জন্ম সেই মাসেই যুগান্তকারী রুশ বিপ্লব ঘটেছিল। তাঁর নেতা ছিলেন লেনিন। ১৯২০ সালের ৩১শে অক্টোবর এ আই টি ইউ সি র জন্ম। ঐ সম্মেলনের মঞ্চ থেকে রুশ বিপ্লবকে স্বাগত জানিয়ে বলা হয় ভারতের শ্রমিক শ্রেনী শুধু ভারতের শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার জন্য ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে না তারা আন্তর্জাতিক সংহতিরও অংশীদার। শুধু ভারতবর্ষেই নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সাম্রাজ্যবাদী শোষনের বিরুদ্ধে সংগ্রামী মানুষকে রুশ বিপ্লব অনুপ্রেরনা দেয়। জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন শক্তিশালী হয়, শ্রমজীবী মানুষ এবং নিপীড়িত মানুষকে তাদের সংগ্রামে নূতন দিশা দেখায়।

নভেম্বর বিপ্লবের প্রভাব পড়ে সারা পৃথিবীতে, এমনকি ধনবাদী দেশেও শ্রমজীবী মানুষের নিরাপত্তা বিষয়ে আইন হয়, মেয়েদের অধিকার স্বীকৃত হয়, বর্তমানে সোভিয়েত ইউনিয়ন নেই। পরবর্তী সময়ে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে রাশিয়া বিপ্লবকে অগ্রসর করতে পারেনি, তাঁর সাধ্যের তুলনায় অতিরিক্ত দায়ও সে গ্রহণ করে, এর চাপ পরে রাশিয়ার অর্থনীতিতে আর ধনবাদ চূড়ান্ত আগ্রাসী হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যায়। ধনবাদ বলে নভেম্বর বিপ্লব ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু বিপ্লব কখনও ব্যর্থ হয় না। একটি বিপ্লব থেকে নতুন বিপ্লবের সভ্যতা অগ্রসর হয়। বর্তমান বিশ্ব অপেক্ষা করছে নতুন বিপ্লবের জন্য। তার গর্ভযন্ত্রনার চিহ্ন এখন সর্বত্র।❐

ইতিহাস

বিনায়ক দামোদর সাভারকর দ্বিজাতিতত্ব ও স্বাধীনতা সংগ্রাম

শান্তনু দত্ত চৌধুরী

গত ২৫ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্টে কংগ্রেস তথা বিরোধী দলের নেতার বিরুদ্ধে বিনায়ক দামোদর সাভারকরের মানহানি করার জন্য আনীত একটি ফৌজদারি মামলার শুনানি ছিল। গত ২০২২ সালে ভারত জোড়যাত্রার সময় রাহুল গান্ধি তাঁর এক বক্তৃতায় বলেন ‘ সাভারকর ইংরেজ সরকারের Servant ছিলেন।’ এই ধরনের মন্তব্য করার জন্য জনৈক নৃপেন্দ্র প্রকাশ নামে এক জ্ঞমড্ডত্বথষ্ঠত্র লক্ষ্ণৌ এর এক আদালতে রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে মানহানি করার অপরাধে এক ফৌজদারি য়ামলা করেন। ওই কোর্ট রাহুল গান্ধিকে কোর্টে হাজিরা দেওয়ার জন্য শমন পাঠায়। এটা এখন সঙ্ঘ পরিবারের কৌশল। সারা দেশের অসংখ্য নিম্ন আদালতে রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে মামলা করে রাখা হয়েছে। মানহানির মামলা। তাতে ২ বছরের বেশি কারাগারের সাজাও হচ্ছে। ফলত সংসদের সদস্যপদ খারিজ। রাহুল গান্ধি লক্ষ্ণৌ আদালতের শমনের বিরুদ্ধে এলাহাবাদ হাইকোর্টে যান। ওই হাই কোর্ট এই শমনের বিরুদ্ধে স্থগিতাদেশ না দেওয়ায় তিনি সুপ্রিম কোর্টে যান।

গত ২৫ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় বিচারপতিদ্বয় এর এজলাসে এই মামলাটির শুনানি হয়। রাহুল গান্ধির পক্ষে আবেদনে তাঁর আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি বলেন, তাঁর মক্কেল রাহুল গান্ধি সংবিধানের ১৯(১) (এ) ধারা অনুযায়ী যে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নাগরিকের প্রাপ্য তার বলে উপরোক্ত মন্তব্য করেন। তাঁর মক্কেলের বিরুদ্ধে এই মামলা হচ্ছে ছেলেমানুষী (Frivolous) ও হয়রানি করার জন্য (Vexatious) অকারণ মামলা। বিচারক মাননীয় দীপঙ্কর দত্ত বলেন , সাভারকর একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী । কোনও স্বাধীনতা সংগ্রামীর বিরুদ্ধে কিছু বলা যায় না। তাঁদের জন্যই আমরা স্বাধীন হয়েছি। গান্ধিজিও অনেক সময় যখন বড়লাটকে চিঠি লিখতেন তখন Yours faithful Servant লিখতেন। মাননীয় বিচারক শ্রীদত্ত অবশ্য গান্ধীজির এরকম কোনও চিঠির নমুনা দেননি যাতে তিনি ক্ষমা চাইছেন ও মুক্তির জন্য প্রার্থনা করছেন। তিনি বলেন রাহুল গান্ধির দেশের ইতিহাস ও ভূগোল সম্পর্কে কোনোই জ্ঞান নেই। তবে তাঁর পিটিশনে জোরালো আইনগত যুক্তি আছে। তাই তিনি শমন থেকে অব্যাহতি পাবেন। তবে ভবিষ্যতে কোনও স্বাধীনতা সংগ্রামী সম্পর্কে কোনও আপত্তিজনক মন্তব্য করলে সুপ্রিম কোর্ট নিজে থেকে ব্যবস্থা অবলম্বন করবে বলে মাননীয় বিচারপতি সতর্ক করে দেন। অভিষেক মনু সিংভি বলেন তাঁর মক্কেল সমাজে শান্তি চান। অবশ্য বোঝা গেলো না এই মামলায় কি বিচার্য বিষয় ছিল রাহুল গান্ধির দেশের ইতিহাস ও ভূগোল সম্পর্কে জ্ঞান ? নতুবা মাননীয় বিচারপতি ওইরকম মন্তব্য করলেন কেনো ?

বিনায়ক দামোদর সাভারকর

এইবার আমরা বিনায়ক দামোদর সাভারকরের সংক্ষিপ্ত জীবনী সম্পর্কে জ্ঞাত তথ্য দেখতে পারি । সাভারকর (১৮৮৩ - ১৯৬৬) প্রথম জীবনে (১৯০৪ সালে)তিলকের দ্বারা প্রভাবিত হন। তিনি 'অভিনব ভারত সোসাইটি' নামে গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলেন।১৯০৬ সালে তিনি ইংল্যান্ডে আসেন ও সেখানে ভারতের স্বাধীনতার দাবির অন্যতম প্রচারক ও সংগঠক শ্যামাজিকৃষ্ণ বর্মার 'ইন্ডিয়া হাউসে' যোগ দেন। সাভারকরের অনুপ্রেরণায় মদনলাল ধিংরা নামে এক যুবক ১৯০৯ সালে কার্জন ওয়াইলি নামক ইংরাজ রাজকর্মচারীকে হত্যা করেন।মদনলালের ফাঁসি হয়।এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে সাভারকর গ্রেপ্তার হন।তাঁকে যখন জাহাজে করে দেশে নিয়ে আসা হচ্ছিল, তখন তিনি মার্সাই বন্দরের কাছে জাহাজ থেকে পালিয়ে যান ও সাঁতরে ফরাসি উপকূলে ওঠেন।কিন্তু তিনি পুনরায় গ্রেপ্তার হন। দেশে ফিরিয়ে এনে তাঁকে বিচার করে আন্দামানে নির্বাসিত করা হয়।

১৯১১ সালে সাজাপ্রাপ্তির অব্যবহিত পর সাভারকর প্রথম তার সাজা বা শাস্তি লাঘব করার জন্য বোম্বাই সরকারের কাছে আবেদন করেন।বোম্বাই সরকার তাঁর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে 'পত্র নং ২০২২ তারিখ ৪ এপ্রিল ১৯১১' মারফৎ তাঁর আবেদন প্রত্যাখ্যান করে। তিনি সেলুলার জেলে আনিত হবার একমাস পর ১৯১১ সালের ৩০ আগস্ট আবার মুক্তির জন্য আবেদন করেন ।এই আবেদন খারিজ হয় ৩ সেপ্টেম্বর । সাভারকরের ক্ষমা প্রার্থনা করে পেশ করা তৃতীয় আবেদনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি এটি গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিলের হোম মেম্বার স্যার রেজিনাল্ড ক্র্যাকডগের হাতে ১৯১৩ সালের ১৪ নভেম্বর জমা দেন।ইনি সেলুলার জেল পরিদর্শন করতে এসেছিলেন।এই আবেদনে সাভারকর নিজের সম্পর্কে লেখেন

'তিনি মহামান্য সরকারের 'Prodigal Son' (উড়ণচন্ডী ছেলে) , যে তার পিতৃতুল্য অভিভাবক সরকারের দরজায় ফিরতে চায়।ক্ষ্ম তিনি এই চিঠিতেই লিখেছিলেন যে ' তার কারামুক্তি বহু ভারতীয়দের মনে ইংরেজ শাসন সম্পর্কে আস্থা ও বিশ্বাসের জন্ম দেবে।'তিনি আবেদনে একথাও বলেন, 'সংবিধান সম্পর্কে আমার আস্থাজ্ঞাপক মত পরিবর্তন দেশের ও বিদেশের সেই সমস্ত বিপথে পরিচালিত ভারতীয় তরুণ ও যুবক, যারা আমাকে পথপ্রদর্শক মনে করেন, তাদের আবার সঠিক পথে ফেরৎ নিয়ে আসবে। আমি সরকারের সেবা করবার জন্য, তাদের ইচ্ছানুযায়ী যে কোনো দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে ইচ্ছুক।আমি আমার বিবেক অনুযায়ী মত পরিবর্তন করে এই পথ গ্রহণ করেছি ও আমার ভবিষ্যৎ আচরণই তার সাক্ষ্য দেবে বলে আশা করি।আমাকে কারাগারে রেখে দিলে যা পাওয়া যাবে তা কারামুক্তির ফলে যা হতে পারতো তার সঙ্গে আদৌ তুলনীয় নয়।'

১৯২০ সালের ৩০ মার্চ সাভারকর ক্ষমা প্রাপ্তির জন্য তাঁর পঞ্চম আবেদনপত্রটি সরকার সমীপে পেশ করেন।এতে তিনি লেখেন 'এতদিন পর্যন্ত বাকুনিনপন্থীদের উগ্রপন্থার পথে বিশ্বাসী হলেও আমি তলস্তয় বা ক্রপৎকিনের শান্তিপূর্ণ দার্শনিক নৈরাজ্যের পথেও কোনও অবদান রাখিনি বা সাহায্য করিনি।আমার অতীত বৈপ্লবিক প্রবণতা সত্ত্বেও, এখন আমি সরকারের ক্ষমা প্রার্থনা পাবার জন্য বলছিনা।আমার ১৯১৪ ও ১৯১৮ সালের আবেদনগুলি দেখলে বোঝা যাবে আমি দৃঢ়তার সঙ্গে সংবিধান যা মি. মন্তেগু (ভারত সচিব) দেশের জন্য প্রবর্তন করেছিলেন তা মেনে চলাই ছিল আমার উদ্দেশ্য।মি. মন্তেগুর ওই সংস্কার এবং তার প্রয়োগ আমাকে আমার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আরো দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করেছে। সাম্প্রতিক সময়ে আমি জনসমক্ষে আমার সংবিধান প্রক্রিয়া সম্পর্কে অগ্রগতির পক্ষে দাঁড়ানোর কথা ঘোষণা করতে প্রস্তুত আছি'।

উপরোক্ত চিঠিগুলি পড়লেই বোঝা যায় যে সাভারকর আর কখনো সরকার বিরোধী আন্দোলন করবেন না , বিপথগামী তরুণদের সঠিক পথে নিয়ে আসবেন, ব্রিটিশ রাজ প্রণীত সংবিধান মেনে চলবেন ও সরকারের সেবা করবেন বলে সরকারকে আশ্বস্ত করছেন । তিনি তাঁর কথা রেখেছিলেন। কারা মুক্তির পর সাভারকর ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত আর কখনও স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেননি, তাঁকে আর কারাবাসও করতে হয় নি।সাভারকরের চিঠিগুলির মধ্যে কৌশল থাকতে পারে,কিন্তু তার দ্বারা কাউকে ' চিন্তাবিদ ' বলে সাব্যস্ত করা যায় কি ?

সাভারকর ১৯০৭ সালে ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের সমর্থনে '১৮৫৭ চে স্বতন্ত্র সমর' (The 1857 war of independence) বইটি রচনা করেছিলেন। মনে রাখতে হবে ওই বইয়ে সাভারকর হিন্দু ও মুসলমান সিপাহীদের যে মিলিত লড়াইয়ের কথা উল্লেখ করেছেন তিনি নিজেই তা পরবর্তীকালে বিস্মৃত হয়েছিলেন। সেলুলার জেলের কারাজীবনেই (১৯১১-১৯২১) সাভারকরের চিন্তাধারায় পরিবর্তন ঘটে ও 'হিন্দুত্ববাদী' ভাবধারা বিকশিত হয়। তাঁর আত্মকাহিনী 'মেরা আজীবন কারাবাস (My transportation of life)' পড়লেই তা বোঝা যাবে।ওই কারাজীবনেই সাভারকর সদাসচেষ্ট ছিলেন ধর্মের প্রশ্ন তুলে নানারকম কূটকাচালি সৃষ্টি করে হিন্দু ও মুসলমান

কয়েদিদের মধ্যে গন্ডগোল পাকানোর জন্য।ভাষা ও ধর্মের প্রশ্নেও তিনি ' হিন্দি -হিন্দু -হিন্দুস্তান' এই তত্ত্বের অবতারণা করেছেন তাঁর জেলজীবনেই। এইখানেই পাঞ্জাব ও বাংলার বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর ফারাক। ওঁদের স্থির লক্ষ্য ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ।জেল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সেলুলার জেলে সংগ্রামে সাভারকরের কোনোই ভূমিকা ছিলোনা। সাভারকর প্রাদেশিকতার দোষেও দুষ্ট ছিলেন।

মানিকতলা বোমার মামলার রাজবন্দী উপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় লিখেছেন যে''মারাঠী নেতারা মাঝে মাঝে প্রমাণ করিতে বসিতেন যে যেহেতু বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম' গানে সপ্তকোটি কণ্ঠের কথা আছে এবং ত্রিশ কোটি কণ্ঠের কথা নাই এবং যেহেতু বাঙালী কবি লিখিয়াছেন 'বঙ্গ আমার জননী আমার 'সেহেতু বাঙালীর জাতীয়তাবোধ অতি সঙ্কীর্ণ.....মারাঠী নেতাদের মনে এই বাঙালি-বিদ্বেষের ভাবটা কিছুটা বেশি প্রবল বলিয়া মনে হয়। ভারতবর্ষে যদি একতা স্থাপন করিতে হয় তাহা হইলে তাহা মারাঠার নেতৃত্বেই হওয়া উচিত– ইহাই যেন তাঁহাদের মনোগত ভাব। হিন্দুস্তানী ও পাঞ্জাবীরা গোঁয়ার, বাঙালী বাক্যবাগীশ, মাদ্রাজী দুর্বল ও ভীরু– একমাত্র পেশোয়ার বংশধরেরাই মানুষের মতো মানুষ– নানা যুক্তিতর্কের ভিতর দিয়া এই সুরই ফুটিয়া উঠিত (নির্বাসিতের আত্মকথা,পৃ-৮৮)। ওই সময় সেলুলার জেলে মারাঠী বন্দি ছিলেন মাত্র ৩ জন, তাঁদের নেতা ছিলেন সাভারকর। তাঁর আত্মকাহিনীতে সাভারকর লিখেছেন যে তাঁর কাছে সেলুলার জেলে এক বাঙালি বন্ধু গোপনে পাঠানো একটি চিঠিতে লেখেন ' বাঙালি রাজবন্দিদের বিশ্বাস না করতে, এদের মধ্যে কিছু লোক সরকারের কাছে গুপ্ত খবরগুলো পৌঁছে দিচ্ছে। যদিও এরকম কোনো ঘটনার প্রমাণ কখনও সেলুলার জেলে পাওয়া যায়নি। সাভারকর সেলুলার জেল থেকে ১৯২১ এ মুক্তির পর দুই বছর অন্তরীণ থাকেন । ১৯২৩ এ সালে তিনি তাঁর বিখ্যাত 'হিন্দুত্ব' নামক পুস্তক রচনা করেন।এই পুস্তকের মাধ্যমে তিনিই প্রথম দ্বিজাতিতত্ব

প্রকৃত হিন্দু সেই ব্যক্তি যে 'সিন্ধু নদ থেকে সমুদ্র পর্যন্ত ভূখন্ডকে পিতৃভূমি ও পবিত্রভুমি বলে মনে করে এবং বিশ্বাস করে যে এই ভূখণ্ডই হচ্ছে তাঁর ধর্মের ধাত্রী।' তাঁর মতে যেহেতু মুসলমানরা 'মক্কা' এবংখ্রিস্টানরা 'জেরুজালেম'- কে তাদের পবিত্র ভূমি বলে মনে করে তারা কখনোই হিন্দুত্ব গ্রহণ করতে পারবে না।

প্রচার করেন। তাঁর এই হিন্দুত্বর সঙ্গে অবশ্য প্রকৃত হিন্দু ধর্মের কোনোই সম্পর্ক নেই। সাভারকরের মতে প্রকৃত হিন্দু সেই ব্যক্তি যে 'সিন্ধু নদ থেকে সমুদ্র পর্যন্ত ভূখন্ডকে পিতৃভূমি ও পবিত্রভুমি বলে মনে করে এবং বিশ্বাস করে যে এই ভূখণ্ডই হচ্ছে তাঁর ধর্মের ধাত্রী।' তাঁর মতে যেহেতু মুসলমানরা 'মক্কা' এবং খ্রিস্টানরা 'জেরুজালেম'- কে তাদের পবিত্র ভূমি বলে মনে করে তারা কখনোই হিন্দুত্ব গ্রহণ করতে পারবে না। মুসলিম লিগ মহম্মদ আলি জিন্নার নেতৃত্বে ১৯৪০ সালের ২৪ মার্চ তারিখে লাহোরে তাদের অধিবেশনে ধর্মের ভিত্তিতে 'পাকিস্তান' দাবি উত্থাপন করবার ১৭ বছর আগে সাভারকর ধর্মভিত্তিক জাতীয়তার দাবি উত্থাপন করেন।

সাভারকর সেলুলার জেল থেকে মুক্তি পাবার পর ১৯৩৭ সালে হিন্দু মহাসভার আমেদাবাদ অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে সাভারকর বলেন, 'India cannot be assumed today to be a Unitarian and homogeneous nation– but on the contrary–there are two nations in the main– the Hindus and the Muslims.These are two nations which are living side by side in India.' এই বক্তব্যের সঙ্গে জিন্না ও মুসলিম লীগের বক্তব্যের কোনও পার্থক্য ছিল না।

১৯৩৯ এর সেপ্টেম্বরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে নেতাজি সুভাষচন্দ্র ব্রিটিশ বিরোধী চূড়ান্ত সংগ্রামে যোগ দেবার জন্য আবেদন নিয়ে মহম্মদ আলি জিন্না ও বিনায়ক দামোদর সাভারকর এই দুই নেতার সঙ্গেই পৃথকভাবে দেখা করেন।দুই নেতাই কোনও ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে যোগ দিতে অস্বীকার করেন। সাভারকর প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র লিখেছেন; ...আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কথা শ্রীযুক্ত সাভারকরের আদৌ স্মরণ ছিল না বলে বোধ হয়েছিল এবং ভারতে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীতে যোগদানপুর্বক হিন্দুরা কিরূপে সামরিক শিক্ষা লাভ করতে পারে উহাই ছিল তাঁর একমাত্র চিন্তা। এই সব সাক্ষাৎকার থেকে লেখক (সুভাষচন্দ্র) এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে বাধ্য হন যে মুসলিম লীগ অথবা হিন্দু মহাসভার পক্ষ থেকে কিছুই প্রত্যাশা করা যায় না '(ভারতের মুক্তি সংগ্রাম,পৃ-১৯৯,সুভাষচন্দ্র বসু,আনন্দ পাবলিশার্স)।

১৯৪২ এ ' ভারত ছাড়ো ' আন্দোলনের সময় সাভারকর স্থানীয় নির্বাচিত সংস্থা ও প্রাদেশিক আইনসভার হিন্দু মহাসভার সদস্যদের নির্দেশ দেন যে তারা যেন নিজেদের পদ বজায় রেখে নিয়মিত কাজে যোগ দেন ও সরকারের সঙ্গে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করেন। সাভারকরের এই সময় শ্লোগান ছিল– 'রাজনীতির হিন্দুত্বকরণ' ও 'হিন্দুত্বের

সামরিকিকরণ'। যদিও ওই একই সময় সিন্ধু ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে মুসলিম লিগের সঙ্গে হিন্দু মহাসভা কোয়ালিশন করে মন্ত্রীসভা গঠন করেছিল। বাংলায় শ্যামাপ্রসাদ বাবু লাহোরে ১৯৪০ এ মুসলিম লিগের অধিবেশনে পাকিস্তান দাবির প্রস্তাব উথাপনকারি ফজলুল হকের সঙ্গে একত্রে মন্ত্রীসভা গঠন করেন । লোকে বলত হক - শ্যামা ক্যাবিনেট । ১৯২৬ সালে সাভারকরের জীবনী প্রথম প্রকাশিত হয়। বইটির নাম 'life of Barrister Savarkar', লেখকের নাম চিত্র গুপ্ত। এই বইটিতে প্রথম সাভারকরকে 'বীর' বলে উল্লেখ করা হয় ।কে এই চিত্রগুপ্ত? ইনি আর কেউ নন, সাভারকর নিজে। নিজের প্রচার তিনি নিজেই শুরু করেছিলেন।

মহাত্মা গান্ধির হত্যাকান্ড ও সাভারকর

গান্ধিজির হত্যাকারী নাথুরাম গডসে ও অন্যতম সহযোগী নারায়ণ আপ্তে ছিল সাভারকরের ভাবশিষ্য ।নাথুরামের সাভারকর ভক্তি এমনই প্রবল ছিল যে তাদের হিন্দু রাষ্ট্র প্রকাশনের মুখপত্র ' অগ্রণী ' পত্রিকার শীর্ষে সাভারকরের ছবি মুদ্রিত হত। ওই বর্বর হত্যাকাণ্ডের পাঁচমাস আগে আগস্ট, ১৯৪৭ এ সাভারকর ওই দুজনকে নিয়ে সংগঠনের কাজে বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করেছিলেন। সাভারকর যদিও পুলিশের কাছে ও আদালতে দেওয়া তাঁর বিবৃতিতে এই হত্যাকাণ্ডে তার জড়িত থাকার অভিযোগ অস্বীকার করেছিলেন, কিন্তু সর্বদাই নাথুরামকে শ্রদ্ধার সঙ্গে 'পণ্ডিত নাথুরাম' বলে উল্লেখ করেছিলেন।

গান্ধিজিকে হত্যা করার প্রথম প্রচেষ্টাটি হয়১৯৪৮ এর ২০ জানুয়ারি ।দিল্লির বিড়লা হাউস - গান্ধিজির প্রার্থনা সভায় বোমা ছোঁড়া হয়। অবিলম্বে মদনলাল পাহোয়া বলে একজন ধরা পড়ে ।এর পরেই কারকারে বলে একজন ধরা পরে। এরা দুজনেই এই হত্যা প্রচেষ্টায় যাবার আগে সাভারকরের সঙ্গে দেখা করে তাঁর আশীর্বাদ গ্রহণ করে বলে মদনলালের বন্ধু বোম্বের রুইয়া কলেজের অধ্যাপক ড.জগদীশ চন্দ্র জৈন তাঁর সাক্ষে জানিয়েছিলেন ।

হিন্দু মহাসভা কর্মী দিগম্বর রামচন্দ্র ব্যাজ , ক্ষুদ্র আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবসায়ী সেও পরে রাজসাক্ষী হয়। নাথুরাম ও আপ্তে তাকে বলেছিল, তত্বারাও তাদের দায়িত্ব দিয়েছেন গান্ধীজি, নেহরু ও সুরাবর্দিকে হত্যা করার জন্য। 'ত্বারাও ছিল সাভারকরের ছদ্মনাম ।তারা বোমা বিস্ফোরক্ ,চারটি হ্যান্ড গ্রেনেড ও দুটি রিভলভার চেয়েছিল ও তার জন্য যে কোনও পরিমাণ মূল্য দিতে চেয়েছিলো ।ব্যাজ ১৭ জানুয়ারি হত্যাকারীদের সঙ্গে সাভারকর সদনে যায় ।এই হত্যাকারীও তাদের অন্যান্য সহযোগীরা ঐদিন তত্বারাওয়ের আশীর্বাদ নিতে যান । ফেরার সময় সাভারকর নিচে সিঁড়ির মুখ পর্যন্ত নেমে এসে তাদের বলেছিলেন , যে কাজে যাচ্ছ সফল, হয়ে ফিরে এসো। এরা ১৯ তারিখ দিল্লি এসে পৌঁছয়। সেখানে আগে থেকেই গোপাল গডসে, মদনলাল ও কারকারে হিন্দু মহাসভা অফিসে অপেক্ষা করছিল ।২০ জানুয়ারীর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে নাথুরাম ও আপ্তে ' কে দায়িত্ব দেওয়া হয় মহাত্মা গান্ধিকে হত্যা করার কাজ সম্পূর্ণ করতে ।

সাভারকর কেন অব্যাহতি পেলেন

দায়রা আদালতের বিচারক আত্মাচরণ সাভারকর ছাড়া বাকি সাত জনকে দোষী সাব্যস্ত করেন। গডসে ও আপ্তের প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। দিগম্বর রামচন্দ্র ব্যাজ ক্ষুদ্র আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবসায়ী রাজসাক্ষী হয় ।সাভারকরকে অব্যাহতি দেওয়ার কারণ হিসাবে বিচারপতি বলেন ব্যাজের সাভারকর সম্পর্কিত বিবৃতির স্বপক্ষে কোনও সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় নি। এক্ষেত্রে সাভারকর 'বেনিফিট অব ডাউট'- এর সুযোগ পান। কিন্তু ওই বিচারকই রামচন্দ্র ব্যাজের সাক্ষ্যকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বিশ্বাসযোগ্য বলে উল্লেখ করেন। তাকে ২০, ৩০ জুলাই পর্যন্ত জেরা করা হয়। চলচ্চিত্রাভিনেত্রী শান্তাভাই মোডাক পুনা এক্সপ্রেসে ১৪ জানুয়ারি, ১৯৪৮ এ গডসে ও আপ্তেকে দেখেন। তিনি তাঁর ট্যাক্সিতে এই দু'জনকে সাভারকর সদনের সামনে নামিয়ে দেনবলে সাক্ষ্যদেন। ট্যাক্সিচালক আয়িটাপপা কোটিয়ানও একই কথা বলেন। সিমলা হাইকোর্টের প্রধান বিচারক জি ডি খোসলা ফুলবেঞ্চের পক্ষে তাঁর রায়ে বলেন শান্তা ভাই ও কোটিয়ানের সাক্ষ্য ব্যাজের সাক্ষ্যকেই সত্যায়িত করেছে। কিন্তু দায়রা আদালতের রায়ে সাভারকরকে যে অব্যাহতি দেওয়া হয় তার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীলে না যাওয়ায় সাভারকরের প্রসঙ্গটি আর হাইকোর্টের বিচারে আসেনি।

জে এল কাপুর কমিশনের বক্তব্য

মহাত্মা গান্ধির হত্যার কুড়ি বছর পর জাস্টিস জে.এল.কাপুর তদন্ত কমিশন তাঁদের প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন যে রামচন্দ্র ব্যাজের সাক্ষ্য সঠিক ছিল এবং তা সাভারকরের দেহরক্ষী আপ্পা রামচন্দ্র কাসার ও গজানন বিষ্ণু ডামলের সাক্ষ্য থেকেই প্রমাণিত হয়েছে। জাস্টিস কাপুর তাঁর প্রতিবেদনের উপসংহারে বলেন " All these facts taken together were destructive of any theory other than the conspiracy to murder-by Savarkar and his group." ❐

নাগরিক স্মৃতিচারণা

সর্বাধিনায়ক সতীশ চন্দ্র সামন্ত

মানস ঘোষ

লোকাল ট্রেনে হলদিয়া যাওয়ার পথে একটা ছোট্ট স্টেশন ।নাম - সতীশ সামন্ত হল্ট ।নব্য প্রজন্মের কথা ছেড়েই দিলাম, আমার প্রজন্মের অনেকেই দেখলাম সতীশ সামন্ত কে জানতেন না ।কারো কারো একটু ভাসা ভাসা ধারণা ছিল।

তাই মনে করেছিলাম, ওঁর সংক্ষিপ্ত পরিচয় একটু ফেবুর পাতায় তুলে রাখা দরকার। এর আগে নেতাজির ভাইজি বেলা বোস (মিত্র) -র কাহিনী লিখে ভালো ফল পেয়েছিলাম ।দক্ষিণ পূর্ব রেলপথে তাঁর নামে রয়েছে বেলানগর স্টেশন ।তিনিও ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী। তাঁর স্বামী হরিদাস মিত্র ' র প্রাণদণ্ড হয়েছিল ।মহাত্মা গান্ধির হস্তক্ষেপে মুক্তি পান ।বলাসে গল্প ক'মাস পরে একটি চঞ্চএও বলা হয়। ফলে আরো অনেক মানুষ জানতে পেরেছিলেন।

ক্লাস টেন পর্যন্ত ক্যাপসুল সিলেবাসে ইতিহাস বইতে সব খুঁটিনাটি ঘটনা দেওয়া সম্ভব নয়। এগুলো সাধারণ মানুষের জানাও দরকার। তবেই সে সময়ের ইতিহাস সম্পর্কে খানিকটা পরিষ্কার ধারণা হবে ।যাঁরা সে সময়টাকে একবার বুঝতে শিখে যাবেন Post truth যুগের হোয়াটস্যাপ গল্প পড়ে সহজে বিভ্রান্ত হবেননা।

বিস্মৃত সেনানী সর্বাধিনায়ক সতীশ চন্দ্র

শিরোনামে বিস্মৃত শব্দটি নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। কারণ সতীশচন্দ্র স্বাধীনতা উত্তরকালেও দেশের বৃহত্তর রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছিলেন। ইতিহাসেও অবহেলিত হননি। এমনকি এই কবছর আগেও তাঁর স্মরণে ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ প্রাতিষ্ঠানিক দিক থেকে তাঁর বিস্মরণ ঘটেনি। বিস্মরণ ঘটেছে আমাদের চর্চায়। আমাদের লেখালেখি আর আলোচনায় সেভাবে আর উঠে আসেনা ভারতীয়দের প্রথম নিজস্ব স্বাধীন সরকার অর্থাৎ তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের প্রধানতম ব্যক্তিটির নাম। আসলে আজকাল নানা মিথ্যা গল্প, ইতিহাস বিকৃতির প্রবল স্রোতে নতুন প্রজন্মের একটা বড় অংশ স্বাধীনতা আন্দোলনে যাঁদের প্রকৃত অবদান আছে তাঁদের কথা জানতে পারেনা, বরং উঠে আসছে এমন কিছু তথাকথিত বীরের নাম যাঁরা সেসময় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ব্রিটিশ সরকারের সহায়তা করেছিলেন। তাই, এই উত্তরসত্য কালে দাঁড়িয়ে, কয়েকজন সত্যিকারের বীরের কথা নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার প্রয়োজন বলে মনে হল।

মহিষাদল রাজ হাই স্কুলে পড়ার সময় ১৫বছরের কিশোর সতীশের সঙ্গে পরিচয় হল সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের। জীবনটাই পাল্টে গেল। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছিলেন চরমপন্থী বিপ্লবী (ইনিই পরবর্তীকালে সন্ন্যাস নিয়ে শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ স্বরস্বতী নামে প্রসিদ্ধ হন)। বরিশাল শংকর মঠের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁকে ব্রিটিশ সরকার মহিষাদলে গৃহ অন্তরীণ করে রাখে। তখন কিশোর সতীশকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে এই সন্ন্যাসীর রাজনৈতিক বীক্ষণ। প্রতিজ্ঞা করলেন দেশের স্বাধীনতার লড়াইয়ে অংশ নেবেন এবং তাঁর জন্য আজীবন ব্রহ্মচারী থাকবেন। মেধাবী ছাত্র ছিলেন। বঙ্গবাসী কলেজ থেকে জ্জ(ঙ্খ পাশ করে ভর্তি হলেন বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে। দেড় বছরও কাটলো না সেখানে। গান্ধীজির ডাকে অসহযোগ আন্দোলন নিয়ে দেশ তখন উত্তাল। নিশ্চিত কেরিয়ারের হাতছানি ছেড়ে সতীশচন্দ্র সামন্ত ঝাঁপিয়ে পড়লেন সেই মহাসংগ্রামে। ভিড়ের অংশ থেকে শাসকদের চক্ষুশূল হওয়ার মতো নেতা হতে বেশি সময় লাগলোনা। ১৯৩০ থেকে টানা চার বছর কারাবন্দী থাকতে হল ।এরপর এলো আগস্ট আন্দোলন।

১৯৪২ এর ৮ই আগস্ট । ঐদিন মধ্য রাতে অর্থাৎ ৯ আগস্ট । কংগ্রেস অধিবেশন থেকে গান্ধীজী ক্ষ্মভারত ছাড়োক্ষ্ম আন্দোলনের ডাক দেন। ৯ই আগস্ট ভোরের মধ্যে ইংরেজ পুলিশ গান্ধিজি,তাঁর স্ত্রী কস্তুরবা, সচিব মহাদেব দেশাই, সরোজিনী নাইডু এবং নেহেরু, প্যাটেল, মৌলানা আজাদ সহ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ সদস্যকে কারারুদ্ধ করে । এই সময় ব্রিটিশ শাসকের বর্বরোচিত আচরণের কিছু নমুনা জানলে বিস্ময়ে ও ঘৃণায় স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়। এই নেতৃবর্গকে '৪২ এর ৯ই আগস্ট থেকে ১৯৪৫ এর জুন পর্যন্ত বন্দি রাখা হয়। প্রথমে ১৫ই আগস্ট ১৯৪২ মহাদেব দেশাই, তারপর ফেব্রুয়ারী ১৯৪৪ এ কস্তুরবা গান্ধির বন্দি অবস্থায় বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু হয়। মৌলানা আজাদের অসুস্থ স্ত্রী উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে মারা যান। তাঁর শেষকৃত্যেও তাঁকে যেতে দেওয়া হয়নি। তখন তিনি ছিলেন কংগ্রেস সভাপতি ।পন্ডিত নেহেরুর বোন বিজয়লক্ষ্মী তখন নৈনি জেলে। ওদিকে লখনৌ জেলে তাঁর স্বামী রণজিৎ পন্ডিত শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। জেল বন্দি ইন্দিরা, ফিরোজ বা নেহেরুকে জানানোও হলোনা সে কথা ।

উপরের ঘটনাগুলো থেকে ব্রিটিশদের হিংস্র ও নিষ্ঠুর আচরণ সমন্ধে যেমন জানা যায় , তেমন তৎকালীন নেতৃবর্গের আত্মত্যাগ দেখলেও শ্রদ্ধায় মাথা নুয়ে আসে।সারাদেশ উত্তাল। চলছে ধরপাকড়। নিরস্ত্র মানুষের ওপর পুলিশেরগুলিতে ঘটে গেলো অসংখ্য মৃত্যু। নেতাজি বার্লিন থেকে এই আন্দোলনের সমর্থনে বিবৃতি দিলেন। জনগণের ওপর এই নৃশংস অত্যাচারের প্রতিবাদে আমরণ অনশনে বসলেন গান্ধীজি। তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি হলে সারা পৃথিবীর বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উদ্বেগ প্রকাশ করলেন। তখন ড. বিধান চন্দ্র রায়কে জেল থেকে ছাড়িয়ে গান্ধীজির চিকিৎসার জন্য পাঠাতে বাধ্য হল ইংরেজ সরকার।

এদিকে ৯ই অগাস্টের পরিস্থিতি দেখে মেদিনীপুর জেলার কংগ্রেস নেতৃবর্গ নিজেদের মত করে সংগ্রামের পরিকল্পনা করেন। গ্রেপ্তারী এড়াতে প্রথমে সবাই আত্মগোপন করেন। সেখানে সতীশ চন্দ্র সামন্তের নেতৃত্বে সংগঠন গড়ে ওঠে। গোপনে সব জায়গায় খবর দেওয়া হয়।২৯শে সেপ্টেম্বর হাজার হাজার নিরস্ত্র মানুষ লাঠি বন্দুকের সামনে একুতোভয় হয়ে এগিয়ে যায় তমলুক ও কাঁথি মহকুমার থানাগুলির দিকে। লাঠি ও গুলির আঘাতে নিহত হন দুই শতাধিক মানুষ। শহীদ হন অশীতিপর বীরাঙ্গনা মাতঙ্গিনী হাজরা।

তাঁদের এই বলিদান বিফলে যায়নি। চারটি থানাই দখল হয়ে গেল। সুতাহাটা, তমলুক,মহিষাদল ও নন্দীগ্রাম থানার মাথা থেকে ইউনিয়ন জ্যাক নামিয়ে তোলা হল ভারতের জাতীয় পতাকা। নেতৃত্বে সতীশ সামন্ত, বরদাকান্ত কুইতি ,অজয় মুখোপাধ্যায় ও সুশীল ধাড়া।

এর কদিন বাদেই দুর্গাপুজোর সপ্তমী। সেদিন থেকে একপ্রকার সাইক্লোন , তুমুল বৃষ্টি ও বন্যায় লন্ডভন্ড হয়ে গেল তমলুক কাঁথিসহ মেদিনীপুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। মানুষের দুর্গতির সুযোগে গ্রামে ঢুকে তান্ডব চালালো ইংরেজের পুলিশ ও সেনাবাহিনী । শ্লীলতাহানি, ধর্ষণ, লুঠতরাজ কিছুই বাকি রইল না। (একটা কথা ভেবে অবাক হই, ব্রিটিশ প্রভুদের এই নির্দেশ পালন করেছিল কিছু ভারতীয় পুলিশই। শুধু তাই নয় সেসময় বাংলার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, তিনি ২৬ জুলাই ব্রিটিশ সরকারকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন অসহযোগ আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। পরে অবশ্য তিনি পদত্যাগ করেছিলেন ।

সক্রিয় প্রতিরোধে করতে এবং দুর্ভিক্ষ ও বন্যাত্রাণের ব্যবস্থা করতে গঠিত হল তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার। এই সরকারের নেতৃত্বে সর্বাধিনায়ক সতীশ সামন্ত। গেরিলা কায়দায় প্রতিরোধের জন্য সুশীল ধাড়ার নেতৃত্বে তৈরী হল বিদ্যুৎ বাহিনী।১৭ ই ডিসেম্বর ১৯৪২ তারিখে এই ঐতিহাসিক তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের স্থাপন করা হয়েছিল। সতীশ সামন্ত '৪৩ সালে গ্রেফতার হলেও এই সরকার চলে ১৯৪৪ এর পয়লা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। গান্ধীজি ১৯৪৫ এর ২৫ ডিসেম্বর এসেছিলেন তমলুক ও কাঁথির জনগণকে অভিনন্দন জানাবার জন্য। তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন এক পুত্র মণিলাল, সচিব পেয়ারেলাল , ড. সুশীলা নায়ার , আভা গান্ধী প্রমূখ ব্যক্তিবর্গ ।তিনি ছিলেন মহিষাদলের সত্যাগ্রহ আশ্রমে ।তাঁর কাছে ইংরাজের সহযোগী কিছু জোতদার জমিদাররা চিঠি দিয়ে অভিযোগ করেছিল যে বিদ্যুৎ বাহিনী তাদের ওপর অন্যায় অত্যাচার করেছিল। ২৬ ডিসেম্বর সকালে গান্ধিজি ওই চিঠিগুলি দিয়ে প্রশ্ন করেন ' সতীশ এই অভিযোগগুলি কি সত্য ?' তিনি বলেন, ' বাপু আমায় একদিন সময় দিন অভিযোগগুলি দেখার জন্য।' ঐদিন সন্ধ্যায় মহিষাদল কংগ্রেস দপ্তরে দলের নেতা কর্মীদের সভায় এই চিঠিগুলির কথা উল্লেখ করে সতীশ চন্দ্র বলেন , গান্ধিজি জানতে চেয়েছেন অভিযোগগুলি সত্য কি না ।উপস্থিত কংগ্রেস কর্মীরা বলেন , ' আপনি বলবেন সব অভিযোগ মিথ্যা', সতীশ চন্দ্র বলেন , ' বাপুর কাছে মিথ্যা কথা বলতে পারবোনা।যা সত্য তাই বলবো।ঐ আশ্রমে পরদিন সকালে গান্ধিজির সঙ্গে দেখা করলে তিনি অভিযোগগুলি সম্পর্কে সতীশ চন্দ্রকে প্রশ্ন করেন।সতীশ চন্দ্র বলেন, 'বাপু অনেকগুলি অভিযোগই সত্য।আমরা বহু ক্ষেত্রেই হিংসার আশ্রয় নিয়েছিলাম।' ঘরে তখন পিন পড়লেও আওয়াজ শোনা যেত। কিছুক্ষন নীরব থেকে গান্ধিজি জানতে চান , কেন তারা হিংসার আশ্রয় নিয়েছিলেন ? তখন সতীশ চন্দ্র গান্ধিজিকে বলেন সাইক্লোনের সুযোগ নিয়ে কীভাবে ব্রিটিশ সরকারের পুলিশ ও সেনাবাহিনী গ্রামে গ্রামে ঢুকে ভয়াবহ অত্যাচার করে ও মহিলাদের শ্লীলতাহানি ও ধর্ষণ করে ।তাই তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার পাল্টা হিংসার আশ্রয় নিতে বাধ্য হয় ।এই মর্মান্তিক অত্যাচারের কথা শুনে গান্ধিজি স্তব্ধ হয়ে যান।তিনি জানতে চান 'সেই মা বোনেরা এখন কোথায় ?' সতীশ চন্দ্র জানান তাঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ গৃহে আছে । সমাজ কাউকে ত্যাগ করেনি।তাই শুনে গান্ধিজি খুবই প্রসন্ন হন।

তিনি ডা. সুশীলা নায়ার ও আভা গান্ধিকে ' তোমরা আগামী দুইদিন গ্রামে গ্রামে ঘুরে যতজন সম্ভব এই নারীদের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের কথা শুনবে , লিখবে ও আমাকে জানাবে।' সতীশ চন্দ্র মহিষাদল থেকে একটি

গাড়ি জোগাড় করেন । সুশীলা ও আভা গাড়িতে ও হেঁটে বিভিন্ন গ্রামের ঘরে ঘরে গিয়ে মহিলাদের ওপর অত্যাচারের খবর নিয়ে এসেছিলেন। গান্ধীজির সামনে তাঁরা কিছু বলতে পারেননি, শুধুই কেঁদে ছিলেন।অহিংসার পূজারী গান্ধিজি ২৯ ডিসেম্বর বিকালে মহিষাদলে এক বিরাট জনসভায় ভাষণ দেন।তার পর দিন তিনি কাঁথি চলে যাবেন।

তিনি বলেন তআমি যদি তমলুকে থাকতাম তাহলে সতীশ , অজয়, সুশীলরা নারীর সম্ভ্রম রক্ষা করার জন্য যে হিংসার পথ বিদ্যুৎ বাহিনীর মাধ্যমে গ্রহণ করেছিল ,সেই পথই গ্রহণ করতাম। 'তিনি আরও বলেন, 'অহিংসার অর্থ কাপুরুষতা নয়। নারীর মর্যাদা রক্ষার জন্য হিংসার আশ্রয় নেওয়াও শ্রেয় । নারীর সম্ভ্রম হানি দেখেও যারা অহিংসার দোহাই দিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকে , তারা অহিংসার সৈনিক হবার অযোগ্য ।' তাম্রলিপ্ত সরকার শুধু প্রতিরোধই করেনি, সেসময় দুর্ভিক্ষ ও বন্যাদুর্গতদের যে শৃঙ্খলার সাথে ত্রাণ বিলি করেছিল তাও উল্লেখযোগ্য।

১৯৪৭ এর জানুয়ারিতে সতীশ সামন্ত দিল্লির গণ পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। এছাড়া ১৯৫২ থেকে ১৯৭১ পাঁচবার তিনি সাংসদ হিসেবে নির্বাচিত হন। ১৯৫৯ এ হলদিয়া বন্দরের সূচনার পেছনে তাঁর অবদানকে স্মরনে রেখে তৎকালীন জাহাজমন্ত্রী এই বন্দরের নাম রাখতে চেয়েছিলেন 'সতীশচন্দ্র বন্দর'। সতীশ সামন্ত রাজি না হওয়ায়, একটি জেটি ও রাস্তা তাঁর নামে আছে। এছাড়া আছে তমলুকের কাছে ওনার নামে রেলস্টেশন 'সতীশ সামন্ত হল্ট'। ৪ জুন,১৯৮৩ সালে ব্রিটিশ ভারতের প্রথম স্বাধীন সরকারের সর্বাধিনায়ক সতীশ চন্দ্র সামন্তর জীবনাবসান ঘটে।

আজও তমলুকের মাটিতে পা রাখলে, গায়ে কাঁটা দেয়,বুকের ভেতর শুনতে পাই , ইংরেজের আদালতে দাঁড়িয়ে তাঁর বজ্রকণ্ঠের ঘোষণা, ''আমি স্বাধীন তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের সর্বাধিনায়ক। বিদেশী আদালতের কোনো রায় আমি মানিনা!'' ❐

তথ্যসূত্র

১) তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার - সপ্তাহ পত্রিকার নিবন্ধ , লেখক- শান্তনু দত্ত চৌধুরী

২) Quit India Movement In Bengal And The Tamralipta Jatiya Sarkar by Pradyot Kumar Maity

৩) অন্তর্জাল

ভ্রমণ

ইস্তাম্বুল

সৌর বসু

মন্ট্রিয়াল থেকে ইস্তাম্বুল এসে পৌঁছেছি দুদিন হল। ইস্তাম্বুল আমার অত্যন্ত প্রিয় শহর। এই শহরটি সম্বন্ধে প্রথম ধারণা জন্মেছিল Orhan Pamuk এর 'ইস্তাম্বুল' বইটি পড়ে। পামুকের বইটির মধ্যে একটা বিষাদের ছায়া ছিল। তিনি জন্মেছেন ইস্তাম্বুলে। বড় হয়েছেন ইস্তাম্বুলে, পরবর্তী জীবনে আমেরিকা চলে গিয়েছেন এবং এখনো সেখানে বসবাস করেন।। তার বইটির মধ্যে ইস্তাম্বুল শহরটির বিবর্তনের একটা চমৎকার বর্ণনা আছে। ইস্তাম্বুল বহু প্রাচীন শহর। ইস্তাম্বুলের প্রাচীন নাম কনস্টান্টিনোপল। আমরা ইতিহাস বইয়ে কনস্ট্যানটিনোপলের কথা পড়েছি। রোমান সাম্রাজ্য বাইজেনটাইন সাম্রাজ্য এবং অটোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল কনস্টানটিনোপল। মাঝে কিছুদিন ১২০৪ থেকে ১২৬১ ল্যাটিনরা এই সাম্রাজ্য পরিচালনা করে। ১০০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে কনস্ট্যানটিনোপল ছিল খ্রিস্ট ধর্মের রাজধানী, ইউরোপের সবচেয়ে ধনী মহানগর এবং চীনের সিল্ক রুটের টার্মিনাস। চ্যাঙ আনের পশ্চিমে সবচেয়ে জনাকীর্ণ নগর। ঐতিহাসিক এবং ভূ পর্যটক Dalrymple তাঁর ফ্রম হোলি মাউন্টেন বইয়ে লিখেছেন, বর্বর পশ্চিমের কাছে বাইজান্টিয়ান ছিল, উচ্চতর সভ্যতার পৌরাণিক আলোকবর্তিকা, ধ্রুপদী প্রাচীনত্বের ধ্বংসাবশেষ থেকে উদ্ধারকৃত সমস্ত কিছুর ভান্ডার। পৃথিবীতে অন্য কোনো শহরের এমন দুর্দান্ত অবস্থান নেই যেখানে পাহাড় এবং জলের সাথে কৃষ্ণসাগরের এবং ভূমধ্যসাগরের যোগ সূত্র রচনা হয়েছে। ইস্তাম্বুলের আকাশ রেখায় অপূর্ব স্থাপত্য সম্বলিত ঢেউ খেলানো গম্বুজ , মিনার এবং রাজপ্রাসাদের অবস্থান এবং বসফরাসের জলে তার রঙিন প্রতিচ্ছবি, মনকে টেনে নিয়ে যায়, পৌরাণিক যুগের কল্প কাহিনীর অন্তঃস্থলে।

কনস্ট্যানটিনোপল শহরটিতে আনুমানিক আড়াই লক্ষ লোকের বসবাস ছিল। শহরের রাস্তায় ৭২ টি ভিন্ন ভিন্ন ভাষা শোনা যেত। কপটিক সন্ন্যাসীরা, ইহুদি কাচের ব্লোয়ারদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতেন

পারস্যের রেশম ব্যবসায়ী এবং দানিয়ূবের বরফ পেরিয়ে শহরে আসা জেনিদের ভাড়াটে সৈন্যরা। পঞ্চম শতাধীর দ্বিতীয়ার্ধের মধ্যে শহরটিতে অনেকগুলি রাজকীয় প্রাসাদ এবং ৬১ টি স্নানঘর ছিল। কনস্টান্টিনোপলের পরিধির মধ্যে ৩ শতাধিক মঠ ছিল।

১৪৫৩ সালে কনস্টান্টিনোপোলের পতনের পর শহরটির গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি পায়। অটোমান সাম্রাজ্য সমগ্র ইউরেশিয়ার সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সাম্রাজ্য ছিল। অটোমানরা ক্ষমতায় আসার পর কনস্ট্যান্টিনোপল, ভূমধ্যসাগরের বৃহত্তর বন্দরে পরিণত হয়।

পামুকের 'ইস্তাম্বুল' বইয়ে কনস্ট্যান্টিনোপল সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে পাশ্চাত্য এবং প্রতীচ্যের মানুষের কাছে কনস্টান্টিনোপল ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বহন করে। পাশ্চাত্যবাসী মনে করে ১৪৫৩ সালে কনস্টান্টিনোপলের পতন হয়েছিল। প্রাচ্যের মানুষ মনে করে ১৪৫৩ সালের ২৯ শে মে কনস্ট্যান্টিনোপলের বুকে অটোমান সাম্রাজ্যের বিজয় পতাকা প্রোথিত হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য আরহা , পামুকের স্ত্রী কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার খাতায় ১৪৫৩ সালের ২৯ মে কনস্টান্টিনোপলের বিজয় উল্লেখ করায় আমেরিকান প্রফেসর তাকে জাতীয়তাবাদী বলে নিন্দা করেন।

কানাডার থেকে ফেরার পথে আমরা ইস্তাম্বুল এসে পৌঁছই বেলা দুটো নাগাদ। এয়ারপোর্টের সমস্ত কাজ অর্থাৎ ইমিগ্রেশন এবং আমাদের মালপত্র সংগ্রহ করার পর এয়ারপোর্টের বাইরে আসি। আমাদের একটি নির্দিষ্ট জায়গায় উপস্থিত হতে বলা হয়েছিল। আমরা সেখানে পৌঁছবার পর একটি ছেলে এসে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে আমাদের অপেক্ষা করতে বলল। বাইরে তখন প্রবল গরম। আমরা খোলা আকাশের নিচে একটা বেঞ্চের উপর এসে বসলাম। চতুর পাশে আমাদের মত বহু পর্যটক অপেক্ষা করছে। কেউ দাঁড়িয়ে আছে কেউ পায়চারি করছে। অনেকে আবার দোকান থেকে চা কিনে খাচ্ছে। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরও যখন কেউ আসছে না, তখন আবার ফোন করা হল। এবার একটি মেয়ে আমাদের ফোন ধরল। মেয়েটি জানালো সে এখুনি আসছে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে সে এসে উপস্থিত। আমাদের মালপত্র সে তার জিম্মায় নিয়ে নিল। রাস্তা পার হয়ে আমরা লিফটের সামনে এসে দাঁড়ালাম। মাথার উপরে দেখতে পাচ্ছি রাস্তা দিয়ে গাড়ি চলাচল করছে। ভাবলাম আমাদের উপরে নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু লিফটে প্রবেশ করার পর, লিফট আমাদের নিয়ে নিচে নামতে শুরু করল। লিফট থেকে বেরিয়ে আমরা মেয়েটিকে অনুসরণ করতে শুরু করলাম। মেয়েটি হনহন করে এগিয়ে যাচ্ছে। আমি তো খোঁড়া, তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারছি না। সুতপা বোচকা বুচকি কাঁধে নিয়ে তার পিছনে ছুটতে শুরু করেছে। বেশীদূর যেতে হলো না। মেয়েটি গাড়ি চালকের হাতে মালপত্র নামিয়ে আবার ছুটতে শুরু করেছে। বোধহয় তার জন্য আরো অনেক পর্যটক অপেক্ষা করছে।

আমাদের জন্য একটা বিশাল গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়েছে। গাড়ির চালক তুরস্কের মুসলিম। এয়ারপোর্টে দেখছিলাম এদেশের লোকেদের ভারী সুন্দর দেখতে। গায়ের রং খুব ফর্সা। কালো চুল। বেশভূষায় আধুনিক। মুসলিম মেয়েদের মাথায় স্কার্ফ জড়ানো। মধ্যপ্রাচ্যের মানুষের সৌন্দর্যের কথা আগেই শুনেছি। এবার চাক্ষুষ করলাম।

গাড়ি আমাদের মসৃণ রাস্তা বেয়ে বেগে ছুটে চলেছে।মাঝে মাঝে বড় ব্রিজ। ইতস্তত ছড়ানো ছেটানো লোকালয়। চতুরপাশ বেশ রুক্ষ। আধঘন্টা চলার পর আমরা ইস্তাম্বুল শহরে প্রবেশ করলাম। দূর থেকেই ইস্তাম্বুলের আকাশ রেখায় ঢেউ খেলানো গম্বুজের সারি চোখে পড়ছিল। রোমাঞ্চকর এক অনুভূতি মনকে আবিষ্ট করে রেখেছে। অত্যন্ত প্রাচীন একটি শহরে প্রবেশ করছি। দুই সহস্রাধিক বছরের ইতিহাস বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এই শহর। সুবৃহৎ মসজিদের পাশাপাশি আকাশ ছোঁয়া অট্টালিকার সহাবস্থান। অপরিসর রাস্তা বেয়ে গাড়ির মিছিল, কিন্তু কোথাও কোন হর্নের আওয়াজ নেই। দু'পাশে সুসজ্জিত দোকান। স্কার্ট পরিহিত সুন্দরী মহিলারা ফুটপাত দিয়ে চলাচল করছে। বেশিরভাগের মাথা স্কার্ফ দিয়ে মোড়া। পুরুষেরা ট্রাউজার টি শার্ট পরিহিত। তাদের বেশিরভাগের মধ্যে ব্যস্ততার ছাপ। একটি কাবাবের দোকানে পাশ দিয়ে আমাদের গাড়ি একটি বৃহৎ অট্টালিকার সামনে দাঁড়ালো। সামনেই আমাদের হোটেল রামাদা ইন।

হোটেলে ঘর দেখে বেশ পছন্দই হল। খুব বড় ঘর যে তা নয় তবে জিনিসপত্র রাখার অনেক জায়গা আছে এবং টয়লেটে ঝরনার ব্যবস্থা আছে। এখন অনেক হোটেলে বাথটাব থাকে। বাথটাব ব্যবহার করা বেশ অসুবিধা জনক। তাছাড়া বাথটাব জীবাণুর সংক্রমণের সম্ভাবনা আছে। আমরা জিনিসপত্র গুছিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলাম। ১০-১২ ঘন্টা জার্নির পরে বিশ্রাম না নিলে শরীর তরতাজা হবে না ।

হোটেলের লবিতে এসে যখন দাঁড়ালাম তখন বেলা সাড়ে ছটা। রিসেপশনে খোঁজ নিয়ে জানলাম, এখানে খাবারের কোন ব্যবস্থা নেই। শুধুমাত্র কমপ্লিমেন্টারি ব্রেকফাস্ট পাওয়া যাবে। হোটেলের সামনে কাঁচ দিয়ে ঘেরা জায়গার মধ্যে কয়েকটা চেয়ার টেবিল পাতা। লবির একপাশে একটা কাউন্টার। সেখানে নানাবিধ পানীয়, মায় কোকাকোলা

থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের নরম পানীয় সেইসঙ্গে স্কচ ,ওয়াইন ও অন্যান্য পানীয়ের বোতল সাজানো। কাউন্টারে যিনি আছেন তিনি ইংরেজি বোঝেন না। আকার ইঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলাম চা পাওয়া যাবে কিনা। ইতিবাচক উত্তর পেয়ে সামনের কাঁচের ঘেরা জায়গায় চেয়ার টেনে দুজনে বসে পড়লাম। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার পর শরীর এখন বেশ ঝরঝরে। কাঁচের দেয়ালের ওপারে রাস্তা দিয়ে লোক চলাচল করছে। রাস্তার অপর পাশে একটি দোকানের সামনে রাস্তার উপর চেয়ার টেবিল পাতা । সেখানে কিছু স্থানীয় লোক বসে গল্প গুজব করছে।

কাউন্টারের ছেলেটি এসে আমাদের চা দিয়ে চলে গেল। চায়ের পাত্রটি ভারী সুন্দর দেখতে। কাচের ছোট্ট পাত্র অনেকটা জলের জগের মতো দেখতে কিন্তু কোন হ্যান্ডেল নেই। আমাদের সামনে আরো দুজন বসে চা খাচ্ছিল । তাদেরও একই পাত্রে চা দেওয়া হয়েছে। চা একটু কড়া। চা শেষ করে দাম মিটিয়ে আমরা রাস্তায় নামলাম।

রিসেপশন থেকে আমাদের বলে দিয়েছিল হোটেল থেকে পাঁচ মিনিট এগিয়ে গেলেই একটি ভারতীয় রেস্তোরাঁ আছে ,আপনারা ইচ্ছে করলে সেখানে খাবার জন্য যেতে পারেন। হোটেল থেকে বেরিয়ে, কিছুটা এগিয়েই একটি রাস্তার মোড়। রাস্তা পার হয়ে ডান হাতে একটি গিফট সপের দোকান। সেখানে নানা ধরনের স্থানীয় হস্তশিল্পের কাজ রাখা ।খুব সুন্দরভাবে সাজানো। পরে এখানে আসা যাবে ভেবে আমরা হাঁটতে শুরু করলাম। প্রথমেই একটি সিরিয়ান খাবারের দোকান। ফুটপাতের উপর টেবিল চেয়ার সুন্দরভাবে সাজানো। দোকানের মুখে একটি ছেলে দাঁড়িয়ে, চিৎকার করে বলছে কি কি খাবার তার দোকানে পাওয়া যায়। অনেককে আবার রাস্তা আগলে দাঁড় করিয়ে দিয়ে দোকানের ভিতর নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। হরিদ্বারে অথবা শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলায় যেভাবে খদ্দেরের হাত ধরে টানাটানি করার চেষ্টা করা হয়, অনেকটা সে রকম।সমস্ত দোকানের সামনে বিরাট করে একটি মেনু বোর্ড ঝোলানো আছে। আমরা একেকটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে মেনু বোর্ডে চোখ বোলাচ্ছি। বেশীরভাগ তুরস্কের খাবারের পদ মাংস দিয়ে তৈরি । গরু ভেড়া এবং মুরগির মাংস। ইসলাম ধর্মে শুয়োর খাওয়া নিষিদ্ধ। সে কারণেই শুয়োরের মাংস খুব কম দোকানেই পাওয়া যায়। তিন চারটে দোকানে পরেই একটি ভারতীয় রেস্তোরাঁ। আমরা রেস্তোরাগুলি দেখে ,Beirut Cafe তে এসে ঢুকলাম। দোকানটিতে ভূমধ্যসাগরীয় খাবারের অনেক পদ আছে। আমরা একটি তুরস্কের খাবারের পদ অর্ডার দিলাম। প্রথমেই একটি প্লেটে পাউরুটি (loaf) এবং অলিভ অয়েলের মধ্যে কয়েক টুকরো হার্ব (herb) দিয়ে গেল। যতদিন তুরস্কে ছিলাম দেখেছি প্রথমে এটা পরিবেশন করাই রীতি। আমাদের পদটিতে ছিল ছোট ছোট মুরগির টুকরো, আলু ভাজা ভাত এবং অন্যান্য কিছু সবজি । বেশ সুস্বাদু। তৃপ্তি করে খেলাম।

পরের দিন সকাল সাড়ে সাতটার সময় তৈরি হয়ে রিসেপশনে এসে বসেছি। আমাদের গাড়ি আসবে ৮টা থেকে ৮-১৫ র মধ্যে। ব্রেকফাস্ট হল এখন বন্ধ। ঠিক আটটার সময় হল খুলে দেওয়া হলো। ব্রেকফাস্ট তৈরি। আমরা ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন টেবিল থেকে আমাদের পছন্দমত খাবার নিয়ে এলাম। দুটো টোস্ট, চিজ আলুভাজা বা ফ্রেন্চ ফ্রাই,ওমলেট এবং তার সঙ্গে কিছু ফল- তরমুজ এপ্রিকট প্রভৃতি। সুতপা, এর সঙ্গে দুটো সসেজ নিয়েছে। খাওয়া-দাওয়া শেষ করে কফি খেয়ে যখন রিসেপশনে এসেছি, তখন ৮ ১৫ বেজে গেছে।

মিনিট দশকের মধ্যেই হন্তদন্ত হয়ে এক ভদ্রলোক ঢুকে, এদিক-ওদিক তাকিয়ে আমাদের নাম ধরে ডাকতে শুরু করেছেন। এগিয়ে গিয়ে পরিচয় দিলাম। আমাদের ওকে অনুসরণ করতে বললেন। খানিক এগিয়েই দেখি আমাদের জন্য একটি বাস দাঁড়িয়ে। জায়গাটা বাজার অঞ্চল। চারিপাশে নানা ফলের দোকান, সবজির দোকান ,জামা কাপড়ের দোকান। অনেক লোকজন ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাসে উঠে একেবারে সামনে সিটে বসলাম। এক ইউরোপিয়ান দম্পতি ওখানে বসে ছিলেন। আমাকে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন। আমার সঙ্গে ক্যামেরা ছিল। ভাবলাম ভদ্রতা করে বোধহয় আমাদের জন্য জায়গা ছেড়ে দিলেন।

খানিক পরে বুঝতে পারলাম জায়গাটা Physically Challenged দের জন্য। আমার হাতে লাঠি এবং গলায় কলার থাকার জন্য জায়গাটা আমাকে ছেড়ে দিয়েছে। যে লোকটি আমাদের এখানে নিয়ে এসেছে, সে আমাদের তুলে দিয়ে কোথায় চলে গেছে। খানিক পরে দেখি আরো দু-তিন জনকে সঙ্গে করে সে ফিরে আসছে। তারাও এসে গাড়িতে উঠলো। বিভিন্ন হোটেল থেকে পর্যটকদের তুলে আনা হচ্ছে। ভদ্রলোক এবার ড্রাইভারের সিটে এসে বসলেন। ভাঙ্গাভাঙ্গা ইংরেজিতে কিছু বলার চেষ্টা করলেন। তারপরে গাড়ি চলতে শুরু করল। ড্রাইভার মানুষটি স্থানীয় অধিবাসী এবং চেইন স্মোকার। ঘন ঘন সিগারেট খাচ্ছে। এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই টের পেয়েছি এখানকার লোকেরা প্রচুর সিগারেট খায়। পথে আরও দু এক জায়গায় গাড়ি থামল এবং লোক উঠিয়ে নেওয়া হল। আমাদের ইস্তাম্বুল পরিক্রমা শুরু হয়ে গেছে।

অপ্রশস্ত রাস্তা। রাস্তার দুপাশে বড় বড় বাড়ি। মাঝে মাঝে বিশালাকার মসজিদ। তার মিনারগুলো আকাশে গিয়ে ঠেকেছে। রাস্তায় প্রচুর গাড়ি ,বাস, দ্বিচক্রযান। আমাদের বাস এ রাস্তা সে রাস্তার ঘুরে বড় রাস্তায় এসে পড়ল। সেখানে সবুজ ময়দান, একপাশে সারিবদ্ধ গাছ। প্রচুর লোকজন ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি ক্যামেরায় ছবি তুলে যাচ্ছি, সুতপা ওর আই প্যাডে চারিপাশের দৃশ্যাবলী রেকর্ড করে নিচ্ছে। বাসের যাত্রী ১২ থেকে ১৪ জনের বেশি নয়। বেশিরভাগই সাদা চামড়া। আমরা দুটো পরিবার বাদামী । বাসের চালক মাঝ বয়সী। মাথার চুল পাকা, প্যান্ট শার্ট পরিহিত । মাঝেমধ্যেই আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসছে। আমরা কারণ বুঝতে না পেরেই হাসি বিনিময় করছি। দূরে একটা নদী দেখা যাচ্ছে । আমরা লাফিয়ে উঠলাম বসফরাস প্রণালী ভেবে। বসফরস প্রণালীর কথা বিভিন্ন বইয়ে এত পেয়েছি যে বেশ রোমাঞ্চ বোধ হচ্ছিল। ২০০০ বছরের প্রাচীন একটি শহর। বিভিন্ন সভ্যতার ধাত্রীভূমি। কত ভাষাভাষী মানুষের স্রোত বয়ে চলেছে এই শহরের উপর দিয়ে। কত সওদাগরের নৌকা এসে ভিড় করেছে এই নদীর বন্দরে। কত ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করছে এই বন্দর। দেখতে দেখতে আমরা নদীর বুকে সেতুর উপর এসে পৌঁছেছি। দুপাশে অজস্র জলযান ভেসে যাচ্ছে। নদীর দুই তীরে যতদূর দেখা যায় শুধু ইমারত আর ইমারত। সেতু পেরিয়ে এসে নদীর তীরে আমাদের বাস থেমে গেল। আমাদের বাস থেকে নামিয়ে অন্য আরেকটি বাসে গিয়ে উঠানো হোল। সবযাত্রী এই বাসে যে উঠল তা নয়, অনেকেই নদীর বুকে ভাসমান স্টিমারের দিকে এগিয়ে গেল। একজন সুদর্শন যুবক এসে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করল। পরনে শর্টস এবং টিশার্ট। চোস্ত ইংরাজী বলে। কলেজের ছাত্রটি আজ আমাদের গাইড। আমরা তাকে জিজ্ঞেস করলাম আমরা কি বসফরাস প্রণালীর তীরে এসে দাঁড়িয়েছি।

২০০০ বছরের প্রাচীন একটি শহর। বিভিন্ন সভ্যতার ধাত্রীভূমি। কত ভাষাভাষী মানুষের স্রোত বয়ে চলেছে এই শহরের উপর দিয়ে। কত সওদাগরের নৌকা এসে ভিড় করেছে এই নদীর বন্দরে। কত ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করছে এই বন্দর।

সে জানালো এই নদিটির নাম গোল্ডেন হর্ন। বসফরাস প্রণালীর প্রবেশ পথ। এই প্রবেশপথটির আকৃতি শিং এর মত। এই প্রবেশপথ বা খাড়িটি ঐতিহাসিক ইস্তাম্বুল কে শহরের বাকি অংশ থেকে পৃথক করে রেখেছে। এই নদীটির বুকে অবস্থিত বন্দর গুলি হাজার হাজার বছর ধরে গ্রিক রোমান বাইজেন্টাইন, অটোমান এবং অন্যান্য বাণিজ্য জাহাজগুলির আশ্রয়স্থল।

আমাদের বাস আবার চলতে শুরু করেছে। সুদর্শন গাইড মাঝে মাঝেই ধারাবিবরণী দিচ্ছেন। খানিক এগিয়েই বাঁ হাতি একটি বিল্ডিংকে দেখিয়ে গাইড মুস্তাফা বললেন কনস্ট্যান্টটিনোপল স্টেশন। অটোমান সাম্রাজ্যে এই স্টেশনটি ছিল ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেশের টার্মিনাল স্টেশন। ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেস এশিয়া এবং ইউরোপের মধ্যে চলাচল করতো। কনস্ট্যান্টটিনোপল ছিল ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেসের শেষ স্টেশন।১৮৮৩ থেকে ১৯৭৭ অবধি এই রেল পথে প্যারিস থেকে ইস্তামবুল orient express চলাচল করতো। বর্তমানে স্টেশনটির নাম সিরকোসি। এখানে এখন মেট্রো চলাচল করে।

আমরা এখন যাচ্ছি চামলিকা মসজিদ দেখতে। এই মসজিদটি ২০১৯ সালে উদ্বোধন করেন তুরস্কর রাষ্ট্রপতি এরদোগান। মসজিদটি ইস্তাম্বুলের এশিয়ার প্রান্তে অবস্থিত। ইউরোপীয় অংশ দিয়ে আমরা এখন যাচ্ছি। পথে পড়ল কনস্টান্টিনোপলের প্রাচীর ,দ্বিতীয় -তৃতীয় শতাধীতে নির্মিত। কনস্টান্টিনোপল শহরটি প্রাচীরের দ্বারা বেষ্টিত ছিল, তারই ধ্বংসাবশেষ এখন পড়ে আছে। বসফরাস প্রণালী পেরিয়ে আমরা শহরের এশীয় অংশে প্রবেশ করব। প্রশস্ত রাস্তা বেয়ে আমাদের বাস এগিয়ে চলেছে দু'ধারে বড় বড় অট্টালিকা। আমরা ইস্তাম্বুলের বাণিজ্যিক অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। পথে চোখে পড়লো, ট্রাম্প টাওয়ার। অর্থাৎ ট্রাম্পের বাণিজ্যর প্রসার এই অঞ্চলেও ঘটেছে। শহরের এই অঞ্চলটি বেশ সাজানো। দূর থেকেই বসফরাস প্রণালী চোখে পড়ছিল। কিছুক্ষনের মধ্যেই আমরা বসফরাসের উপর নির্মিত সেতুর প্রবেশ পথে এসে পৌঁছলাম।

সেতুর উপর দিয়ে যেতে যেতে দেখলাম দুপাশে বিস্তৃত জলরাশি, সূর্যের আলো পড়ে চিকচিক করছে। বসফরাসের বুকে ছোট ছোট ঢেউ জেগে উঠে মিলিয়ে যাচ্ছে। সিগালের দল নদীর বুকে ভেসে বেড়াচ্ছে। সেতু পেরিয়ে আমরা এশিয়ার প্রান্তে প্রবেশ করলাম। এই অঞ্চলটা কম জনবহুল। রাস্তার দুপাশে বিস্তৃত এলাকা জুড়ে ঘরবাড়ি। তবে ইউরোপীয় প্রান্তের মতো ঘন সন্নিবিষ্ট নয়। চমৎকার মসৃণ রাস্তা বড় বড় টানেলের ভিতর দিয়েও গাড়ি তীব্র বেগে ছুটছে। টানেলের দেওয়ালে আলোর মালা। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা চামলিকা মসজিদের দ্বার প্রান্তে এসে দাঁড়ালাম। বিশালাকার মসজিদ। মসজিদের কমপ্লেক্সে আর্ট গ্যালারি কনফারেন্স হল

গ্রন্থাগার প্রভৃতি রয়েছে। মসজিদটিতে ৬৩ হাজার মানুষের স্থান সংকুলান হয়। ভূমিকম্পের সময় নাকি এক লাখ অবধি মানুষ এই মসজিদের মধ্যে স্থান পেতে পারে। ২০১৯ সালে তুরস্কের রাষ্ট্রপতি এরদোগান মসজিদের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

আমরা এসকালেটরে চেপে মসজিদের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলাম। চতুর্পাশে পর্যটকের ভিড়। বেশিরভাগ মানুষই মোবাইলে ছবি তুলতে ব্যস্ত। মসজিদের সামনের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণটির ব্যাপ্তি বিশাল। মসজিদটি রাস্তার থেকে অনেক উপরে অবস্থিত হবার ধরুন , এখান থেকে সমগ্র ইস্তাম্বুলের একটা ছবি চোখে পড়ে। অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্য, আমি এখানে দাঁড়িয়ে দুটি মহাদেশের ছবি তুলতে পারছি। মসজিদটি স্থাপত্য ধ্রুপদী অটোমান স্থাপত্যের দ্বারা প্রভাবিত। মসজিদটির ছয়টি মিনার ইসলাম ধর্মীয় বিশ্বাসের ছয়টি নিদর্শন এর প্রতিনিধিত্ব করছে। প্রধান গম্বুজটির পাশে ছোট ছোট আরো অনেকগুলি গম্বুজ। প্রধান গম্বুজটির উচ্চতা ২৩৬ ফুট। ছটি মিনারের উচ্চতা ৩৫১ ফুট। আমরা মসজিদটি পরিক্রমা করতে করতে হাঁপিয়ে উঠছিলাম। মাঝে মাঝে সুন্দর বসার জায়গা আছে। বিশ্রাম নিয়ে মসজিদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলাম। মসজিদের অভ্যন্তরে মেঝে নকশা করা। মাথার উপরে গম্বুজের বিভিন্ন রংয়ের কাচের ভেতর দিয়ে সূর্যের আলো প্রবেশ করছে। মসজিদের অভ্যন্তরে আর কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরির পর আমরা পুনরায় এসকেলেটেরে চেপে নিচে নেমে এলাম।

আমাদের পরবর্তী গন্তব্যস্থান Dolmabahace রাজপ্রাসাদ। অটোমান সাম্রাজ্যের প্রধান কার্যালয়। এটি তুরস্কের বৃহত্তম রাজপ্রাসাদ এবং বসফরাসের তীরে অবস্থিত। এই রাজপ্রাসাদের নির্মাণ সম্পন্ন হয় ১৮৫৬ সালে। এটি নির্মাণ হবার পর থেকে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত এখানে ৬ জন সুলতান বাস করেছেন।। তুরস্ক প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা মোস্তফা কামাল আতাতুর্কের গ্রীষ্মকালীন বাসভবন ছিল এই প্রাসাদটি। তার জীবনের শেষ দিনগুলি এই প্রাসাদেই অতিবাহিত হয়। এই প্রাসাদটিতে সোনা এবং ফটিকের ব্যবহার ব্যাপকভাবে দেখা যায়। সোনালী ছাদ করার জন্য ১২-১৪ টন সোনা এখানে ব্যবহার করা

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বসফরাসের তীরে গ্রিক জেলেদের গ্রাম গড়ে উঠেছিল। অটোমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর বসফরাসের তীরে গড়ে ওঠে ধনীদের গ্রীষ্মকালীন আবাস। পত্তন হয় অটমান সংস্কৃতির।

হয়েছিল বলে শোনা যায়। বিশ্বের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ স্ফটিকের ঝাড়বাতিটি এখানেই সেরিমনিয়াল হলে রাখা আছে। দামি মার্বেল পাথর এই রাজপ্রাসাদের সাজ সজ্জার জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল। রাজপ্রাসাদে ব্যবহৃত কার্পেটগুলিও অত্যন্ত মূল্যবান। মূল হলটিতে যে কার্পেটটি রয়েছে সেই হেরেকে কার্পেটটি, পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম। প্রাসাদটিতে অনেক তৈলচিত্রের সংগ্রহ আছে। বসফরাস উপসাগরের অবস্থান প্রাসাদটির সৌন্দর্য আরো বৃদ্ধি করেছে।

প্রাসাদটিতে ঢোকার মুখে বসফরাসের তীর সংলগ্ন একটি কাফে রয়েছে। সুতপা তখনও রাজপ্রাসাদটি ঘুরে দেখছে। আমি কাফেতে এসে বসেছি। দেশ-বিদেশের পর্যটকের ভিড় এই কাফেতে। সবাই গল্পে ব্যস্ত। আমার সামনে দিয়ে বয়ে চলেছে বসফরাস। কত ইতিহাসের কত সাম্রাজ্যের উত্থান পতনের সাক্ষী এই বসকরাস উপসাগর। বসফরাস প্রনালী কৃষ্ণ সাগরের সঙ্গে মারমারা সাগরকে যুক্ত করে। বসফরাস উপসাগরের এশিয়া এবং ইউরোপ অংশে বড় বড় অট্টালিকা গড়ে উঠেছে। তারই মাঝে মাঝে বিশালাকার সব মসজিদ। যার মিনার গুলি ইস্তানবুলের আকাশ রেখায় ঢেউ খেলানো গম্বুজের পাশাপাশি অবস্থান করছে। অনেক মসজিদই বাইজান্টাইন আমলে খ্রিস্টানদের উপাসনা স্থল ছিল। অটোমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর তার অনেকগুলিকেই মসজিদে পরিণত করা হয়েছে। ইস্তানবুল শহরের বুকে অতীতের স্থাপত্যের সঙ্গে আধুনিক স্থাপত্যের সহাবস্থান মনকে আলোড়িত করে তোলে। ফরহান পামুখ লিখেছেন চারিপাশে জনাকীর্ণ শহরের ধোঁয়া এবং কোলাহলের মধ্যেও এটি এমন একটি জায়গা যেখানে নির্জনতা উপভোগ করা যায় ,স্বাধীনতা খুঁজে পাওয়া যায়।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বসফরাসের তীরে গ্রিক জেলেদের গ্রাম গড়ে উঠেছিল। অটোমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর বসফরাসের তীরে গড়ে ওঠে ধনীদের গ্রীষ্মকালীন আবাস। পত্তন হয় অটমান সংস্কৃতির। পামুক তার ইস্তানবুল বইয়ে লিখেছেন, ১৮ ; ১৯ শতকে মহান অটোমান পরিবার গুলির দ্বারা নির্মিত ওয়ালিস বা জাঁকজমকপূর্ণ জলের ধারের প্রাসাদগুদি বিংশ শতাধীতে প্রজাতন্ত্র এবং তুর্কি জাতীয়তাবাদের আবির্ভাবের সাথে সাথে একটি অপ্রচলিত পরিচয় এবং স্থাপত্যের মডেল হিসেবে দেখা যেতে শুরু করে।

বসফরাসের তীরে বসে, কফির কাপ হাতে নিয়ে ইস্তাম্বুলের অতীত এবং বর্তমান সংস্কৃতির গভীরে ডুব দিয়েছিলাম, মুস্তাফার ডাকে সম্বিত ফিরে এলো।বেলা একটা বেজে গিয়েছে। মুস্তাফা বলল এবার তোমাদের

খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে। তার আগে তোমরা যদি চাও তুরস্কের মিষ্টি এবং ফলের দোকানে তোমাদের নিয়ে যেতে পারি। আমাদের সঙ্গে ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার এক দম্পতি। তারা এ ব্যাপারে খুব উৎসাহী। ৫০ মিটায় এগিয়ে একটি দোকানে মুস্তাফা আমাদের নিয়ে গেল। সেখানে থরে থরে তুরস্কের বিভিন্ন প্রকারের মিষ্টি সাজানো। অনেক ধরনের চকোলেটও আছে। দোকানদার আমাদের যথা সম্ভব আপ্যায়ন করল। বিভিন্ন ধরনের মিষ্টির নমুনা আমাদের সামনে নিয়ে এসে খেয়ে দেখতে বলল।আমরা প্রত্যেকেই একটা করে মিষ্টি তুলে খেয়ে দেখলাম বেশ সুস্বাদু। কোনোটা এপ্রিকটের সঙ্গে অন্যান্য ফল দিয়ে তৈরি। কোনটা খুব ভালো জাতের খেজুর, আখরোট পেস্তা দিয়ে তৈরি। মিষ্টির সাধ দারচিনি কমলালেবু বা পুদিনার মত। তুরস্কের মিষ্টি আমাদের সকলের বেশ পছন্দ হলো । আমরা কয়েকটা বিভিন্ন স্বাদের মিষ্টির প্যাকেট ক্রয় করলাম ।প্রসঙ্গত বলে রাখি শান্তিনিকেতনের ফিরে এসে মিষ্টির প্যাকেট খুলে দেখি আমরা যে স্বাদের মিষ্টি পছন্দ করেছিলাম, সেগুলোর বদলে অন্য মিষ্টি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তখন আর কিছু করার নেই।

মিষ্টির দোকান থেকে বেরিয়ে আমাদের খাবারের দোকানে নিয়ে যাওয়া হল। অনেকগুলো সিঁড়ি ভেঙ্গে আমরা খাবারের জায়গায় এসে পৌঁছালাম। ছোট খাবারের দোকান। ঘরের ভিতরে তিনটে টেবিল পাতা। আমরা দুজন আর অস্ট্রেলিয়ান দম্পতি একটি টেবিলে বসলাম। খাবারের আয়োজন খুব সাধারণ। ডালের স্যুপ, চিকেন স্টেক এবং আলুভাজা। বেশ তৃপ্তি করে খেলাম। খেতে খেতে অস্ট্রেলিয়ান দম্পতির সঙ্গে বেশ আলাপ জমে উঠলো। ভদ্রলোক ভদ্রমহিলার বয়স ৭৫ এর ধারে পাশে। দুজনই বেড়াতে এসেছে। এখান থেকে ওরা স্টিমারে করে গ্রিসে যাবে। গ্রিসে কিছুদিন কাটিয়ে ইউরোপের আরও দু তিনটি দেশ ঘুরে নিজের দেশে ফিরে যাবে। খাবারের সঙ্গে তরমুজও ছিল। অস্ট্রেলিয়ান দম্পতি জানালেন ওদের দেশের তরমুজের ফলন খুব বেশি এবং তরমুজ ওদের খুব প্রিয় খাদ্য।

ইউরোপের প্রান্ত থেকে স্টিমারে চেপেছি, অপর প্রান্তে এশিয়া মহাদেশ। প্রনালীর দুপাশ জুড়ে ঘনবসতি। নদীর বুকে ছোট ছোট ঢেউ। তীব্র হওয়া বইছে । অদূরে একটি চারতলা জাহাজ। নোঙর ফেলে রয়েছে। কৃষ্ণসাগর এবং ভূমধ্যসাগরের সংযোগকারী এই প্রনালিটি কৌশলগত কারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

দুপুরের খাবারের পর আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো বসফরাসের তীরে। আমরা এখন স্টিমারের চেপে বসফরাসের বুকে ঘুরে বেড়াবো। উপসাগরের তীরে সার বেঁধে স্টিমার দাঁড়িয়ে। অনেক স্টিমার নদীবক্ষে ভাসমান। আমরা একটা বাঁশের খুঁটির ওপর পা দিয়ে লাফিয়ে স্টিমারে উঠলাম। ছোট্ট স্টিমার। মেশিন রুমের পাশে তিন-চারটে টেবিল পাতা। টেবিলে উপরে ফুলদানি, রঙীন ফুল দিয়ে সাজানো। ছাদেও বসার ব্যবস্থা রয়েছে। আমরা নিচের দিকেই বসলাম। ইউরোপের প্রান্ত থেকে স্টিমারে চেপেছি, অপর প্রান্তে এশিয়া মহাদেশ। প্রনালীর দুপাশ জুড়ে ঘনবসতি। নদীর বুকে ছোট ছোট ঢেউ। তীব্র হওয়া বইছে । অদূরে একটি চারতলা জাহাজ। নোঙর ফেলে রয়েছে। কৃষ্ণসাগর এবং ভূমধ্যসাগরের সংযোগকারী এই প্রনালিটি কৌশলগত কারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে এই প্রনালিটি নিয়ন্ত্রণ করে তুরস্ক। কোন রণতরী এই পথ অতিক্রম করতে গেলে তুরস্কের সম্মতি প্রয়োজন। রাশিয়ার তেলের ট্যাংকার গুলি এই জলপথে যাতায়াত করে। পামুকের লেখায় পাওয়া যায়, ছেলেবেলায় তিনি বসফরাস অতিক্রম করা জাহাজগুলি গণনা করতেন। তার মধ্যে ছিল রোমানিয়ান ট্যাংকার, সোভিয়েত জাহাজ ,ট্রাপজন থেকে আসা মাছ ধরার নৌকো, বুলগেরিয়ান জাহাজ, সমুদ্রে যাওয়ার তুর্কি সামুদ্রিক যাত্রীবাহী জাহাজ , সোভিয়েত আবহাওয়া জাহাজ, ইতালির পণ্যবাহী জাহাজ প্রভৃতি। পামুক লিখছেন একদিন শীতের সকালে তিনি কম্বলের ভিতরে কাঁপতে কাঁপতে পরীক্ষার পড়া তৈরি করছিলেন, তখন এক আশ্চর্য দৃশ্য তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তিনি দেখেন অন্ধকারের মধ্যে থেকে একটি বিশাল জাহাজ ক্রমশ ভেসে উঠছে। অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে জাহাজটি যখন এগিয়ে চলেছে, তার অভিঘাতে বাড়ির জানালা দরজা কাঁপতে শুরু করেছে। সোভিয়েত যুদ্ধ জাহাজটি একটি দুর্গের মত। তিনি আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন ঠান্ডা যুদ্ধ তখন সবে শুরু হয়েছে।। তিনি ভাবছিলেন তার অবশ্যই কিছু করা কর্তব্য। কিন্তু না তিনি কিছুই করতে পারেননি। তবে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, বসফরাস প্রণালীর ভু রাজনৈতিক গুরুত্বের কথা। আজ আমরা সেই পামুকের অত্যন্ত প্রিয় বসফরাস প্রণালীর বুকে ভেসে বেড়াচ্ছি। অদ্ভুত এক অনুভূতিতে মন ভরে যাচ্ছে।

আমরা যখন তীরে এসে নেমেছি তখন চারটে বেজে গেছে। আমরা ঠিক করলাম এবার হোটেলে ফিরে যাব। আমাদের গাইড মোস্তাফাকে বললাম আমাদের ট্যাক্সি ডেকে

দাও। ট্যাক্সিতে চেপে মুস্তাফাকে অশেষ ধন্যবাদ জানালাম। তার জন্য আমাদের একটা ছোট্ট উপহার ছিল। তার হাতে তুলে দিতে তার চোখ চকচক করে উঠলো। আমরা হোটেলে ফিরে এলাম।

পরের দিন ঠিক সকাল সাড়ে আটটায়, বাসের চালক এসে হাজির। আমাদের দেখে এক গাল হেসে ওকে অনুসরণ করতে বলল। গতকালের মতোই আমরা বাসে এসে বসলাম। আজকে আমাদের গন্তব্য হিপ্পোড্রোম, ব্লু মস্ক, হাজিয়া সোফিয়া ইত্যাদি। গতকালের মতোই গোল্ডেন হর্নে এসে আমাদের বাস বদল করতে হল। আজকে আমাদের নতুন গাইড। সাদি, এসে আমাদের সঙ্গে আলাপকরেগেল। হিপ্পোড্রোম শহরেরইউরোপীয়প্রান্তে অবস্থিত। বাস আমাদের একটা রাস্তার মোড়ে এসে নামিয়ে দিল। এখান থেকে সরু রাস্তা নিচু হয়ে মোড় নিয়েছে। রাস্তার ধারে সার বেঁধে গাড়ি ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে রয়েছে। গাড়ির ভিড়ের মধ্যে পথ খুঁজে নিয়ে আমরা কিছুদূর এগিয়ে গেলাম। গাইড আমাদের আগেই বলেছিল আজকে ২ কিলোমিটার হাঁটতে হবে। রাস্তা বাঁক নিতেই দেখি প্রশস্ত চত্বর। চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পর্যটকদের জটলা। বসার জন্য বেঞ্চ রয়েছে। অনেক পর্যটক রেলিং এর উপর বসে রয়েছেন । এর মধ্যে একটি অনুসন্ধান কেন্দ্র আছে। আমাদের গাইড সাদি, দলের সবাইকে এক জায়গায় ডেকে নিল।

হিপ্পোড্রোম, ভাইজান সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্ট্যান্টিনোপলের একটি সামাজিক ও ক্রীড়ার কেন্দ্র ছিল। এখানে বিভিন্ন ধরনের বিনোদনের ব্যবস্থা ছিল। রথের দৌড় ছাড়াও বিভিন্ন উত্তেজক খেলা অনুষ্ঠিত হতো। হিপ্পোড্রোম ছিল গ্রিক শহরগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আমরা যেখানে বর্তমানে দাঁড়িয়ে রয়েছি সেখানে ৪০০ মিটার লম্বা এবং ১৩০ মিটার প্রশস্ত হিপ্পোড্রোমটি অবস্থিত ছিল। বর্তমানে অবশ্য তার প্রায় কোন চিহ্নই নেই। এই হিপ্পোড্রোমটিতে প্রায় এক লাখ লোক বসে খেলা দেখতে পারত। গাইড শাদীর কাছ থেকে জানা গেল হিপ্পোড্রোমটি ঘিরে বিভিন্ন স্মৃতিস্তম্ভ ছিল। এখনো একটি ওবেলিস্ক বা স্মৃতিস্তম্ভ রয়েছে। গ্রানাইটের এই ওবেলিস্ক টির গায়ে কারুকার্য করা। এটি প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছরের প্রাচীন। মিশরের লুৎফরের কণার্ক্য মন্দিরে এটি নির্মিত হয়েছিল। সেখান থেকে ১৪০৯ খ্রিস্টপূর্বাধে স্তম্ভটি এখানে নিয়ে আসা হয় । এছাড়া একটি সার্পেন্টাইন কলামও এখানে রয়েছে। স্মৃতিস্তম্ভটিতে সম্রাটের একটি ছবি খোদাই করা আছে। সম্রাটের দৃষ্টি হিপ্পোড্রোমের রথের দৌড়ের মাঠের দিকে নিবদ্ধ। নিচের দিকে সম্ভবত ঘোড়ায় টানা একটি বাথটাবের ছবি অঙ্কিত।

হিপ্পো ড্রোমের একপাশে বিশালাকার ছয়টি মিনার সম্বলিত ব্লু মস্কের অবস্থান। ব্লু মস্কটির মাথায় একটি বিশাল গম্বুজ এবং তারই পাশাপাশি আরো কয়েকটি ছোট বড় গম্বুজ রয়েছে।। এই মসজিদটি অটোমান রাজত্বে ১৬০৯ থেকে ১৬১৭ র মধ্যে নির্মিত হয়েছে। ইসলামিক স্থাপত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন এই মসজিদ। মসজিদটি হাজার হাজার ইজনিক টাইলস এবং নীল রংয়ের ফুলের নকশা দিয়ে সজ্জিত। মসজিদের ভিতরে সুলতান আহমেদের একটি সমাধি রয়েছে। মসজিদটি বাইজেন্টাইন যুগের হাজিয়া সোফিয়া স্থাপত্যের পাশে নির্মাণ করা হয়েছে। মসজিদের ভিতরে বিরাট উঠোন ।সেখানে একসঙ্গে প্রায় লক্ষাধিক মানুষ প্রার্থনা করতে পারে।

মসজিদটির অভ্যন্তরে বিভিন্ন নকশা সম্বলিত কুড়ি হাজারেরও বেশি টাইলস রয়েছে। আমরা যখন মসজিদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলাম তখন সেখানে হাজার হাজার পর্যটক ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমরাও ভীড়ে মিশে গেলাম। মসজিদের দেওয়াল নীল রংয়ের টাইলসের উপরে বিভিন্ন ধরনের মোটিফ সহকারে অলংকৃত করা হয়েছে। মসজিদের মেঝেতেও বিভিন্ন ধরনের মোটিফ ব্যবহার করা হয়েছে। সব মিলিয়ে মসজিদটিতে নীল রঙের ব্যবহার চোখে পড়ে। সে কারণেই মসজিদটির নাম নীল মসজিদ বা ব্লু মস্ক। মসজিদটিতে আলো প্রবেশের জন্য আড়াইশোর অধিক জানলা রয়েছে। মসজিদটির ছাদ থেকে ঝোলানো ঝাড়বাতি, মসজিদের শোভা বৃদ্ধিকরেছে। মসজিদের উঠোনের দরজাটিতে চমৎকার কাঠের কাজদৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমরা অনেকক্ষণ মসজিদে কাটিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। বাইরে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে মসজিদের ছবি তোলা হল।

আমাদের পরবর্তী গন্তব্য হাজিয়া সোফিয়া। বাঁধানো রাস্তা ধরে আমরা চলেছি। রাস্তার একপাশে রাস্তার একপাশে স্যুভেনির শপ। সেখানে পর্যটকদের ভিড়। অপর পাশে খোলা ময়দান। যেখানে আগে নানা রকম বিনোদের আসার বসত। এখন সেখানে তৃষ্ণা নিবারণের নানা আয়োজন। ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে কেউ লেবুর জল পান করছে, কেউ আবার কোকাকোলা বা আইসক্রিম খাচ্ছে। আমাদের গাইড সাদি একটু দূরে আমাদের দলের অন্যান্যদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে। দলের আরো দু একজন বেঞ্চে বসে জিরিয়ে নিচ্ছে। আমরা গাইডের কাছে যেতেই, সাদি, হাজিয়া সোফিয়ার ইতিহাস বর্ণনা করতে শুরু করলো। হাজিয়া সোফিয়া বাইজেন্টাইন যুগের একটি অনন্য সাধারণ কীর্তি। এটি নির্মিত হয় ৫৩২ থেকে ৫৩৭ খ্রিস্টাধের মধ্যে।প্রকোপিয়াস

বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের একজন ঐতিহাসিক, হজিয়া সোফিয়া সম্পর্কে বলেছিলেন যে এটি বাইরের সূর্যের আলোয় আলোকিত হয় না, দর্শনার্থীর দ্বারা আলোকিত হয়। এই অপূর্ব স্থাপত্যটি, বাইজেন্টাইন যুগের স্থাপত্যকলার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। হাজিয়া সোফিয়া কনস্টান্টিনোপলের ক্যাথিড্রাল হিসাবে ৩৬০ খ্রিস্টাধ থেকে ১৪৫৩ সাল অবধি পরিগণিত হয়ে এসেছে।

১৪৫৩ সালে কনস্ট্যানটিনোপলের পতনের পর এটিকে মসজিদে পরিণত করা হয়। মসজিদে পরিণত হওয়ার পর হাজিয়া সোফিয়ার মিনার গুলি যুক্ত করা হয়। বাইজেন্টিন সাম্রাজ্যের সম্রাট প্রথম জাস্টিনিয়ান এই ক্যাথিড্রালটি নির্মাণ করেন। এই গির্জাটি পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ক্যাথিড্রালের মর্যাদা পায় । প্রায় হাজার বছর পরে ইস্তামবুলের মসজিদগুলি এই ক্যাথিড্রালটির অনুকরণে নির্মিত হয়। হাজিয়া সোফিয়ার মেঝেটি মার্বেল দিয়ে তৈরি। এই মার্বেল সংগ্রহ করা হয়েছিল মারমারা সাগর এবং মারমারা দ্বীপ থেকে। হাজিয়া সোফিয়ার মেঝেটি অনেক কবির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল । তারা একে প্রবাহিত এক নদীর সঙ্গে তুলনা করেছেন।

এই হাজিয়া সোফিয়ার সঙ্গে তুরস্কের নব জাগরণের নেতা কামাল আতাতুর্ক - এর স্মৃতি জড়িয়ে আছে। তিনি ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী নেতা ছিলেন । ১৯২৩ সালে ক্ষমতায় এসে তিনি খলিফাতন্ত্রের অবসান ঘটান। হাজিয়া সোফিয়া মসজিদকে একটি সংগ্রহশালায় রূপান্তরিত করেন। সম্প্রতি এরদোগান ক্ষমতায় বসে এটিকে আবার মসজিদে রূপান্তরিত করেছেন ।

সমগ্র এই হিপ্পোড্রোম অঞ্চলটি অত্যন্ত আকর্ষণীয়। ইস্তাম্বুলের ঘনবসতি পেরিয়ে এরকম একটি উন্মুক্ত ময়দানে এতগুলি স্থাপত্যের অবস্থান মনকে অন্য এক জগতে নিয়ে চলে যায়। বাস্তবিক এই অঞ্চলটি আজ থেকে ২০০০ বছর আগে একইসঙ্গে আধ্যাত্মিক এবং বিনোদন কেন্দ্রের পীঠস্থান ছিল। সমগ্র অঞ্চলটি ঘুরে দেখতে কয়েক ঘন্টা সময় লেগে যায়। হাজিয়া সোফিযার সামনে থেকেই ট্রাম লাইন চলে গেছে শহরের অভ্যন্তরে। ট্রাম লাইন ধরে এগোলে শহরের ব্যস্ততম অঞ্চল। ১৪৬১ সালে নির্মিত গ্র্যান্ড বাজারটিও এখানে অবস্থিত। অটোমান সম্রাটের নির্মিত এই বাজারটি বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ একটি বাজার।এই বাজারটিতে সাদিকে বলা ছিল খাবার শেষে একটি ট্যাক্সি ডেকে দেওয়ার জন্য ।আমরা হোটেলে ফিরবো ।

হোটেলে ফিরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে নিচের লবিতে এসে বসেছি। আমাদের এক বন্ধু ইস্তাম্বুলে থাকে আজকে তার দেখা করতে আসার কথা।ঠিক সাড়ে ছটা নাগাদ পিকলু এসে উপস্থিত। পিকলু পেশায় চিকিৎসক। বিগত ১০ বছর সে ইউনাইটেড নেশানে চাকুরীরত। আফ্রিকার কয়েকটি দেশ ঘুরে এখন ইস্তাম্বুলে পোস্টেড। সঙ্গে আমাদের আলাপ বহুদিনের শান্তিনিকেতন সূত্রে। বিগত প্রায় কুড়ি বছর ওর সঙ্গে ফেসবুকে মাঝে সাঝে যোগাযোগ হলেও চাক্ষুষ দেখা হয়নি। ডাক্তারি পেশা ছাড়াও ও একজন কুইজ মাস্টার। কলকাতা অনেক কুইজ সঞ্চালনা করেছে।

আমি যখন চাকরি-সুত্রে বীরভূমে তখন ও নানুরে চিকিৎসা কেন্দ্রে কর্মরত ছিল। সে আজ প্রায় ৩৫ বছর আগেকার কথা। পিকলু আসার কিছুক্ষণের মধ্যে আড্ডা জমে গেল। ও বেশ কয়েক বছর হল ইস্তাম্বুলে আছে। ইস্তাম্বুল কিরম লাগছে বলা তে বললাম অনেক দিনের ইচ্ছা ছিল ইস্তাম্বুলে আসার।

তিন দিন ঘুরে বেড়িয়ে শহরটাকে খুব প্রাণবন্ত বলে মনে হয়েছে। ইস্তাম্বুলের মানুষ যা বুঝলাম, খুবই বন্ধু বৎসল এবং আড্ডা মারতে ভালবাসে। পিকলু শুনে বলল, দোকানে কেনাকাটা করতে গেলে একটু সতর্ক থেকো। তুমি কোন জিনিস কিনতে চাইলে ওরা তোমায় দেখাবে। পছন্দ হলে তুমি দ্বাখত্বদ্ধ করে দিতে বললে সুন্দর করে সাজিয়ে দেবে। কিন্তু তুমি বাড়ি গিয়ে দেখবে হয়তো তুমি যেটা চেয়েছো সেটার বদলে অন্য কিছু দিয়ে দিয়েছে। বাস্তবিক আমরা,' টার্কিজ ডিলাইট' বলে কতগুলো মিষ্টির প্যাকেট কিনেছিলাম, শান্তিনিকেতনের সেগুলো খুলে দেখি, আমাদের পছন্দ করা জিনিসগুলো আসেনি। তখন মন খারাপ করা ছাড়া আর কিছু করার নেই। ইস্তাম্বুলের রাস্তাঘাটে নাকে মুখে প্লাস্টার করা অনেক নারী পুরুষ আমাদের চোখে পড়েছে। আমরা একটু অবাকই হয়েছিলাম। পিকলুকে বলাতে ,ও বলল যে ইস্তাম্বুল প্লাস্টিক সার্জারি খুব উন্নতমানের। তোমরা যে নাকে মুখে প্লাস্টার করা লোকজন দেখেছো ,তার কারণ প্লাস্টিক সার্জারি। এখানে মুড়ি মুরকির মত প্লাস্টিক সার্জারি করে নাক মুখের চেহারা পাল্টে ফেলে। বললাম এখানকার মানুষদের তো ভারি সুন্দর দেখতে। ও হেসে বলল ওরা আরো সুন্দর হতে চায়।

ঘন্টাখানেক গল্প করে ইস্তাম্বুলের অনেক টুকি টাকি খবর পাওয়া গেল। ফেরার সময় ও আমাদের সঙ্গে নিয়ে একটা রেস্তোরা দেখিয়ে বলল এখানে খেতে পারো। তুমি ওয়াইন খেতে চাইছো এখানে ওয়াইনও পাবে। রাতের খাওয়া সেরে আমরা যখন হোটেলে পৌঁছলাম তখন রাত দশটা বেজে গেছে। পরদিন আমরা যাব ক্যাপাডোশিয়া। তুরস্কের আনাতোলিয়ার আর একটি ঐতিহাসিক অঞ্চল। ❐

আন্তর্জাতিক

শান্তিতে নোবেল পুরস্কার এক প্রহসন

মহম্মদ আমিন

শান্তিতে নোবেল প্রাইজ পেতে আমেরিকার কতটা বড় দালাল হওয়া যায় তার বড় প্রমাণ মারিয়া মাচাদো। এটা অবশ্য পৃথিবী আগে থেকে জানে। অতীতে কয়েকজন কেবল সঠিকভাবে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। বাকিদের প্রমাণ করতে হয়েছে যে সে কত বড় মার্কিন দালাল। ইউনূসকে ক্ষমতায় বসানো , এবার মারিয়াকে ক্ষমতায় বসানোর জন্য এই পুরস্কার দিয়েছে। সে তাঁর এই জয় উৎসর্গ করেছেন তাঁর প্রভু ডোনাল্ড ট্রাম্পকে। একদা এই মহিলা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অনুরোধ করেছিলেন ভেনেজুয়েলাকে আক্রমণ করার জন্যতো তিনি নোবেল না পাবেন না তো কে পাবেন ?

ভেনেজুয়েলা সবচাইতে উত্তম তেলের দেশ। দেশটিতে একটা অভিজাত শ্রেণী তেলের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে বিলাসবহুল জীবন যাপন করতো। দেশটির রাজধানী কারাকাস বস্তিতে ভরে যায়। দেশটি বাংলাদেশের ৬ গুন বড়, লোক ৩ কোটি। এত তেলের দেশ, কিন্তু দারিদ্রে ভরাকে গ্রাম গঞ্জে কাজ ছিল না সরকারী সহায়তার অভাবে। তেল এত থাকার ফলে বিদ্যুতের কমতি হওয়ার কথা ছিল না। নাইজেরিয়ার মত বিশাল তেলের দেশে বিদ্যুৎ ঘাটতি ছিল সারাদেশে। কেবল নগরগুলো আলোকিত ছিল। তাই গরিবরা এসে নগরে ভীর করে। দুনিয়ার সবচাইতে বড় গুরি ড্যাম (সিমন বলিভার ড্যামও বলে) ভেনেজুয়েলায়, যার একটি ড্যাম থেকে ১০,২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ তৈরি হয়। তারপরও এই দেশ ছিলো গরিবে ভরা। আমি ড্যাম ও নদী নিয়ে একটি বই লেখার সময় থেকে এ ড্যামকে জানার জন্য ভেনেজুয়েলাকে মনে রাখি। সেই থেকে উত্তরণের জন্য জনগণের সংগ্রামের মুখে বার বার সামরিক অভ্যুত্থান হয়। কাছে কিউবা, ওপাড়ে আমেরিকা। কিউবার কারণে ও অভিজাত শ্রেণীর জবরদস্তির কারণে সেখানে বামপন্থার শক্তি বাড়ে। শুরু হয় আমেরিকার তা ঠেকানোর সব কৌশল। হুগো শ্যাভেজ সামরিক বাহিনীতে ছিলেন। ১৯৯২ সালে এক সামরিক অভ্যুত্থান করে ব্যর্থ হন ও জেলে যান। জনতার সমর্থন বিশাল ছিল বলে গণতান্ত্রিক প্রেসিডেন্ট হন বিপুল ভোটে হুগো শ্যাভেজ ১৯৯৯ সালে। জয়ী হয়ে তিনি দেশের সংবিধান পরিবর্তন করেন। সবচাইতে বড় তেলের দেশটির সব তেল খনি জাতীয় করণ করেন। সকল গরিব জনগণকে জমি বাড়ীর ব্যবস্থা করে গ্রামে পাঠান। যন্ত্র কিনে দিয়ে কৃষির ব্যাপক উন্নতি করেন। গ্রামে কিউবার মত ডাক্তার পাঠান। কারাকাস বস্তিমুক্ত হয়। বার বার আমেরিকা হুগো শাভেজকে হারাতে চেষ্টা করেন। তিনবার তিনি জনগণের ফেয়ার ভোটে জিতে গেছেন। আমেরিকার অভিজাততন্ত্রের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। জাতিসংঘে প্রেসিডেন্ট বুশকে তশয়তানদ বলেন। ২০১৩ তে তিনি দুর্ভাগ্যবশত ক্যান্সারে মারা যান।

সেই থেকে ধনিক শ্রেণী আবার ক্ষমতা ও দেশের অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ পেতে মরিয়া। হুগো শ্যাভেজের অনুসারী নিকোলাস মাদুরো সে বিজয় ধরে রাখতে চেষ্টা করতে গিয়ে বার বার নির্বাচিত হন। নির্বাচন নিয়ে আমেরিকা বাংলাদেশের মত নানা বিতর্ক তোলে। এবং ড. ইউনূসের মত একজন অভিজাত পরিবারের লোককে সামনে আনে, মারিয়া মাচাদো। (ড. ইউনূসও অভিজাত পরিবারের সন্তান।) মনে হয় ড. ইউনূসের মত তাকে ভেনেজুয়েলার কর্তা বানাবেন। এটা করা মানে অভিজাত তন্ত্রকে বিজয়ী করা। তবে কাজটি বাংলাদেশের মত সহজ না। যেহেতু সেখানের বিশাল জনগুষ্টি রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। জামাতের মত রাজাকার বা ধর্ম রাজনীতি নাই। অভিজাত শ্রেণী জয়লাভ করলে সাধারণ জনগণ ক্ষমতা হারালে হয়তো গৃহযুদ্ধ হবে। দেশের সম্পদ শোষণ আমেরিকার জন্য সহজ হবে না। আমেরিকা সেখানে এখন সামরিক তৎপরতাও চালাচ্ছে।

সোভিয়েত পতন না হলে বা হুগো শ্যাভেজ মারা না গেলে দেশটি পুরা সমাজতান্ত্রিক হতো ।সমাজতান্ত্রিক বহুদলীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে টিকে থাকতো। এখন আমেরিকার মাস্তানী রোধ করার মত শক্তি প্রযুক্তির বিশ্বে কমে গেছে।

সেজন্য মাদুরোর দরকার একটি ফেয়ার নির্বাচন দিয়ে দেওয়া। শেখ হাসিনা যে ভুল করেছেন মাদুরোর তা না করা ভাল। শক্তি সঞ্চয় করতে শক্তিকে সময় দেয়া। হুগো শ্যাভেজ যা পারতো এখন তা করা যাবে না। তেলের দেশটি কিউবার মত নানা অবরোধে এখন দরিদ্র দেশ। যদিও এখনো মাথাপীছু আয় ৪ হাজার ডলার। কিউবা নানা সংকটে পড়ে উদ্ধারের সম্ভাবনা নেই, যেহেতু সোভিয়েতের মত শক্তি চিন নয়। সে ব্যবসা করা জরুরী মনে করছে। তাই গণতন্ত্রে ফিরতে হবে তবে বৈষম্য বিরোধী আন্দোলন বজায় রেখে। আগের মত বিপ্লব আর হবে না। যা হবে গণতন্ত্রেই হতে হবে। সমাজতন্ত্র হলেও।

বুঝতে হবে নোবেল শান্তি পুরস্কার ভেনেজুয়েলার সাধারণ জনগণের জন্য বিশাল অশান্তির বার্তা। তাকে এখন এই আক্রমণ সামাল দিতে হবে। ❐

পুস্তক পর্যালোচনা

রাশিয়ায় এক বাঙালি বিপ্লবীর খোঁজে

গোলাম আম্বিয়া খান লুহানী এক অজানা বিপ্লবীর কাহিনি বই থেকে এক বাঙালি বিপ্লবীর বর্ণিল জীবন ওবহুমুখী কার্যকলাপ সম্পর্কে গভীর অন্তর্দৃষ্টি পাওয়া যায়। বইটির লেখক প্রথম আলো সম্পাদক মতিউররহমান লুহানীর জীবন ও কর্ম উদ্‌ঘাটনকরেছেনতাঁর ৪২ বছরের নিরলসসাধনায়। ১৭ সেপ্টেম্বরলুহানীর ৮৭তমমৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে প্রথম আলোর পাঠকদের জন্য বইটির একটি পর্যালোচনা প্রকাশ করা হলো,লিখেছেন ***খলিলউল্লাহ্।***

ঔপনিবেশিক শাসনের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পেতে উপনিবেশিত সব দেশকেই সর্বোচ্চ মূল্য দিতেহয়েছিল। অনেক ত্যাগ,তিতিক্ষা আর সংগ্রামের বিনিময়ে এসেছিল স্বাধীনতা; কিন্তু ব্রিটিশসাম্রাজ্যের 'মুকুটরত্ন' খ্যাত ভারতের মতো এত বিশাল ও বিস্তৃত পরিসরের দেশে ও দেশের বাইরে বিরাট ক্যানভাসে স্বাধীনতার সংগ্রাম মনে হয় আর কোনো উপনিবেশের স্বাধীনতার জন্য করতে হয়নি।

আমরা সাধারণত ভারতীয় উপমহাদেশে সক্রিয় ব্রিটিশবিরোধী বিপ্লবীদের আত্মত্যাগ নিয়ে আলোচনা করি। কিন্তু এমন অনেকে ছিলেন, যাঁরা ব্রিটিশ শাসন থেকে ভারতকে মুক্ত করতে বিদেশের মাটিতে বসে অসংখ্য বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে নিজেদের উৎসর্গ করেছিলেন। বাংলাদেশের জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনা কিংবা জনপ্রিয় লেখাজোখাতেও তাঁদের আত্মত্যাগের গল্প খুব কমই উঠে আসে।অথচ এই বিপ্লবীদের রয়েছে এমন এক গৌরবোজ্জ্বল বীরত্বগাথা, যা ভারতীয় উপমহাদেশসহ সারাদুনিয়ায় ন্যায়ের পক্ষে সংগ্রামরত সব মানুষের জন্য নিঃসন্দেহে অনুপ্রেরণার। কল্পনা করুন, পুলিশেরচোখ এড়াতে একজন বিপ্লবী সিঙ্গাপুরের উপকূল থেকে ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপে পাড়ি দিচ্ছেনজেলে নৌকার সাহায্যে। আরেকজন ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের নজর এড়াতে সাঁতরে পাড়ি দিচ্ছেন মিসরের সুয়েজ খাল। এসব ঘটনা থেকে দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের অদম্য প্রচেষ্টার দু, একটি উদাহরণ পাওয়া যায়।

বিদেশে বিপ্লবী কার্যকলাপের জন্য সুভাষ চন্দ্র বসু সুপরিচিত। তবে তাঁরও অনেক আগে একদলব্যক্তি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ত্বরান্বিত করতে ইউরোপ জুড়ে বিভিন্ন প্রচেষ্টায় নিয়োজিত ছিলেন। শুরুতে তাঁরা জার্মানি এবং পরে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে সাহায্য চেয়েছিলেন। তাঁদেরই একজন ছিলেন ১৮৯২ সালের ২ ডিসেম্বর বাংলাদেশের সিরাজগঞ্জে জন্মগ্রহণকারী গোলাম আম্বিয়াখান লুহানী।

তিনি একা নন, মস্কোয় আরও দুজন বাঙালি বিপ্লবী লুহানীর মতো একই ভাগ্য বরণ করেছিলেন। একজন তৎকালীন বিক্রমপুরের (বর্তমানে মুন্সিগঞ্জ) বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং অন্যজন সাতক্ষীরার অবনী মুখোপাধ্যায়।

যেভাবে বইটির সূচনা

সম্প্রতি প্রকাশিত গোলাম আম্বিয়া খান লুহানী এক অজানা বিপ্লবীর কাহিনি বই থেকে বিপ্লবীলুহানীর বর্ণিল জীবন ও বহুমুখী কার্যকলাপ সম্পর্কে গভীর অন্তর্দৃষ্টি পাওয়া যায়। বইটির লেখক প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান লুহানীর জীবন ও কর্ম উদ্‌ঘাটন করেছেন তাঁর ৪২ বছরের নিরলস সাধনায়।

মতিউর রহমান ১৯৮১ সালে দিল্লি ভ্রমণে গেলে বিজ্ঞানী ও কমিউনিস্ট নেতা ড. গঙ্গাধর অধিকারীর কাছ থেকে লুহানীর কথা প্রথম জানতে পারেন। গঙ্গাধর অধিকারী ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস নিয়ে কাজ করার সময় লুহানীর বহুমুখী কার্যকলাপ সম্পর্কে জানতে পারেন। ১৯২৯সালের মিরাট ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁর গ্রেপ্তারের ঘটনাটি বেশ আলোচিত। তাঁর মুক্তির দাবিতে বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন ব্রিটিশ সরকারের কাছে চিঠি লিখেছিলেন।

১৯৮১ সাল থেকে মতিউর রহমান লুহানী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য বার্লিন, মস্কো, দিল্লি ও কলকাতার বিভিন্ন আর্কাইভের শরণাপন্ন হন। তিনি সবকিছু জোগাড় করতে পারেননি বলে বইয়েরভূমিকায় স্বীকার করেছেন। তবে আপাত 'বিস্মৃত' এই বিপ্লবীর ওপর যে পরিমাণ তথ্য তিনি সংগ্রহ করেছেন, সেটিও অভূতপূর্ব। এই বইয়ে লেখক লুহানীর বহুমুখী কাজের পাশাপাশি পারিবারিক জীবনের বিভিন্ন দিকও তুলে এনেছেন।

বইটিতে প্যারিস থেকে সিরাজগঞ্জে মায়ের কাছে লেখা লুহানী ও তাঁর স্ত্রী গ্যাব্রিয়েলের চিঠি এবংতাঁকে দেশে ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় লুহানীর পরিবারের সদস্য ও কলকাতার একটি শিপিং এজেন্সির মধ্যকার চিঠি আদান, প্রদান ও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বইটির প্রতি লেখকের গভীর নিষ্ঠার প্রমাণ পাওয়া যায় একটি ঘটনা থেকে। ১৯৮০',এর দশকের মাঝামাঝি রুশ ইতিহাসবিদ ও ভারত বিশেষজ্ঞ লিওনিদ মিত্রোখিনের সঙ্গে লেখকের দেখা হয়েছিল মস্কোয়। ১৯৯১ সালে মিত্রোখিন দিল্লি থেকে প্রকাশিত সোভিয়েত ল্যান্ড পত্রিকায় একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেন। সেখানে তিনি প্রথমবারের মতো তিনজন বাঙালি বিপ্লবী— বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়,অবনী মুখোপাধ্যায় ও গোলাম আম্বিয়া খান লুহানীর করুণ পরিণতির কথা প্রকাশ করেন। তাঁদের সবারই বর্তমান বাংলাদেশের সঙ্গে যোগসূত্র ছিল।

নিবন্ধের শেষে মিত্রোখিন লিখেছেন, মতিউর রহমান লুহানীকে নিয়ে একটি বই লেখার পরিকল্পনাকরছেন, যা এই বিপ্লবীর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে নতুন অন্তর্দৃষ্টি দিতে পারে। কয়েক দশক পরঅবশেষে ২০২৪ সালের অক্টোবরে সেই প্রতীক্ষিত বইটি আলোর মুখ দেখেছে।

বইটি থেকে জানা যায়, লুহানী প্রবেশিকা পরীক্ষা (বর্তমান মাধ্যমিক পরীক্ষার সমমান) পাস করারপর ভারতের আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন এবং ১৯১৪ সালে লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিকসঅ্যান্ড পলিটিক্যাল সায়েন্সে ভর্তি হন। তিনি ছিলেন বাংলাদেশের বিখ্যাত মিডিয়া ও চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব ফতেহ লোহানী ও ফজলে লোহানীএবং তাঁদের বোন বিশিষ্ট গায়িকা অধ্যাপক হুসনা বানু খানমের মামা। ফজলে লোহানীর মাধ্যমে মতিউররহমানের যোগাযোগ ঘটে গোলাম আম্বিয়া খান লুহানীর ভাগনে মেজর জেনারেল (xî.) হেলাল মোর্শেদেরসঙ্গে; যিনি বহু বছর ধরে পারিবারিক চিঠিগুলো সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন। বইটি যখন প্রকাশের জন্য প্রস্তুত, তার কয়েক মাস আগে ২০২৪ সালের মে মাসে একটি কাকতালীয় ঘটনা ঘটে। নিউইয়র্কের শিল্প-গবেষক জুলিয়া বডেউইন মতিউর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ করে লুহানীরস্ত্রী গ্যাব্রিয়েল সোয়েন সম্পর্কে জানতে চান। এই যোগাযোগের সূত্র ধরে

রুশ ইতিহাসবিদ ও ভারত বিশেষজ্ঞ লিওনিদ মিত্রোখিনের সঙ্গে লেখকের দেখা হয়েছিল মস্কোয়। ১৯৯১ সালে মিত্রোখিন দিল্লি থেকে প্রকাশিত সোভিয়েত ল্যান্ড পত্রিকায় একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেন। সেখানে তিনি প্রথমবারের মতো তিনজন বাঙালি বিপ্লবী; বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, অবনী মুখোপাধ্যায় ও গোলাম আম্বিয়া খান লুহানীর করুণ পরিণতির কথা প্রকাশ করেন। তাঁদের সবারই বর্তমান বাংলাদেশের সঙ্গে যোগসূত্র ছিল।

আরও বিস্তর খোঁজাখুঁজির পর জানা যায় যে গ্যাব্রিয়েল ছিলেন একজন ফরাসি মডেল ও ফ্যাশন ডিজাইনার।

লুহানীর খোঁজে

মতিউর রহমানের সংগ্রহ করা নথিপত্র থেকে জানা যায়, লুহানী লন্ডনে কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত না থেকেও শ্রমিক আন্দোলন এবং সোভিয়েত বিপ্লবের সমর্থনে কাজ করেছেন। জীবিকা নির্বাহের জন্য তিনি সাংবাদিক ও শিক্ষক হিসেবে কাজ করতেন। ১৯২০ থেকে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত তিনি ফ্রান্স, জার্মানি ও সুইজারল্যান্ডে বসবাস করেন এবং সেখানকার সংবাদপত্রগুলোতে ভারতের রাজনৈতিক ও শ্রমিক আন্দোলন নিয়ে লেখালেখি করেছেন। ইংরেজি ছাড়াও তিনি ফরাসি, ফারসি, জার্মান ও হিন্দি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন।

১৯২১ সালে বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে লুহানী প্রথম একটি প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী দলের অংশ হিসেবে মস্কো সফর করেন। কিন্তু দলটি কমিন্টার্নের সমর্থন পেতে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে। তবে লুহানী কিছু সময়ের জন্য সেখানে থেকে কমিন্টার্নের প্রচার বিভাগ অ্যাজিটপ্রপে কাজ করেন। প্যারিসে থাকাকালে তিনি ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রকাশনা দ্য ম্যাসেস অবইন্ডিয়া সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।এ ছাড়া তিনি কমিটি প্রো-হিন্দুর (ভারতীয় অর্থে) সঙ্গে কাজ করেছেন। এই কমিটি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের পক্ষে কাজ করত। ফরাসি লেখক, সাংবাদিক ও রাজনৈতিক কর্মী ওঁরি বারবুস ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা। বারবুসের লেখার মাধ্যমে 'লস্ট জেনারেশন',এর বহু লেখক প্রভাবিত হয়েছিলেন, যাঁদের মধ্যে আর্নেস্ট হেমিংওয়ে ও এরিখ মারিয়া রেমার্ক অন্যতম।

প্যারিসে থাকাকালে লুহানীর বিরুদ্ধে ব্রিটিশ বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগ উঠলে সেখানে তাঁর থাকার অনুমতি বাতিল করা হয়। এ বছরের জুলাই মাসে আমি প্যারিসে গেলে মোঁপানাস এলাকায় লুহানীরসেই বাড়ির ঠিকানায় যাই। বাড়ির উল্টো দিকে থাকা একটি ক্যাফের লোকদের সঙ্গে আলাপে লুহানীরকাহিনি শুনে তাঁরা অবাক হন। ক্যাফের একজন জানান, বাড়িটি এখনো আবাসিক ভবন হিসেবেই আছে; কিন্তু কোনো বাঙালি থাকেনবলে তাঁরা জানেন না।

অপ্রত্যাশিতভাবে পাশের সড়কেই পেয়ে যাই লুহানীর স্ত্রীর পোর্ট্রেট আঁকা প্রখ্যাত শিল্পী আমেদেও মোদিলিয়ানির বাড়ি। যদিও লুহানীর সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর পরিচয়ের অনেক আগেই মোদিলিয়ানি সেই পোর্ট্রেট এঁকেছিলেন। বাড়ির ভেতরে ঢুকে বুঝতে পারলাম, এটি এখন আবাসিক হোটেল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

১৯২৫ সালের অক্টোবরে লুহানী স্থায়ীভাবে মস্কোয় চলে যান। ১৯২৮ সালে তাঁকে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ এবং ১৯৩৩ সালে সোভিয়েত নাগরিকত্ব দেওয়া হয়। এ সময়েতিনি কমিউনিস্ট আন্দোলনের বৈশ্বিক কেন্দ্র কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালে (কমিন্টার্ন) বিভিন্ন পদেদায়িত্ব পালন করেন।

লুহানীর ওপর লেখা এই বইয়ে তাঁর বর্ণাঢ্য জীবনের নানা দিক উঠে এসেছে। তিনি সাংবাদিক,অনুবাদক, গবেষক ও শিক্ষক হিসেবে কমিন্টার্নসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছেন। যুক্ত ছিলেন পিজ্যান্টস ইন্টারন্যাশনাল ও মোপার (বিপ্লবীদের সাহায্য করার আন্তর্জাতিক সংস্থা) সঙ্গে।

এ ছাড়া তিনি রাশিয়ান সোভিয়েত ফেডারেটিভ সোশ্যালিস্ট রিপাবলিক, নারিমানভ ইনস্টিটিউট, ইনস্টিটিউট অব ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ ও কমিউনিস্ট ইউনিভার্সিটি অব দ্য টয়েলার্স অব দ্য ইস্ট-একাজ করেছেন। তিনি মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় বিষয় নিয়েও বক্তৃতা দিতেন।মস্কোয় অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ কমিন্টার্ন কংগ্রেসে লুহানী ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। সেখানে তিনি এমএন রায়ের সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্য প্রকাশ্যে তুলে ধরেন। ১৯৬৪ সালের ৩০ আগস্ট, লিংক-এর মস্কো সংবাদদাতা পি উন্নিকৃষ্ণান একটি নিবন্ধে উল্লেখ করেন যে লুহানী জাতীয় ও ঔপনিবেশিক বিষয়ে কমিন্টার্নের একজন পরামর্শক হিসেবে কাজ করতেন। মতিউর রহমান ৪২ বছরের নিরলস প্রচেষ্টা ওআবেগের সংমিশ্রণে সংগৃহীত নথিপত্র কাজে লাগিয়ে লুহানীর এই অসাধারণ জীবন ও বহুমুখী অবদানকে ফুটিয়ে তুলেছেন।

লুহানী ছাড়াও এই বইয়ে বার্লিন ও মস্কোভিত্তিক ভারতীয় বিপ্লবীদের কার্যকলাপ ও উদ্যোগেরওপর আলোকপাত করা হয়েছে। ১৯২১ সালে লুহানী, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং পান্ডুরাজ খানখোজেযৌথভাবে 'ইন্ডিয়া অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ল্ড রেভল্যুশন' নামে একটি থিসিস রচনা করে রুশ বিপ্লবের নেতাভ্লাদিমির লেনিনের কাছে পাঠিয়েছিলেন। এর প্রত্যুত্তরও তাঁরা পেয়েছিলেন লেনিনের কাছ থেকে। উল্লেখ্য, 'নাইটিঙ্গেল অব দ্য ইস্ট' নামে পরিচিত বিখ্যাত রাজনৈতিক কর্মী ও কবি সরোজিনী নাইডুরছোট ভাই ছিলেন বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। এই বইয়ে অন্তর্ভুক্ত লুহানীর প্রবন্ধ ও প্রতিবেদন থেকে তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিখ্যাত বিপ্লবী এম এন রায় এবং সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও তাত্ত্বিক অন্তর্দৃষ্টির প্রশংসা করেছেন। সৌম্যেন্দ্রনাথ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বড় ভাই দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাতি ও সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছেলে।

মরণোত্তর সম্মান

বইটিতে ব্যবহৃত সোভিয়েত গোয়েন্দা নথিপত্র থেকে জানা যায়, স্তালিনের শাসনামলে লুহানী সন্দেহও অবিশ্বাসের শিকার হয়েছিলেন। সেই সময়ে অনেককে ভিন্নমতের অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। এই করুণ পরিণতি থেকে লুহানীও রেহাই পাননি।

১৯৩৮ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর স্তালিনের নির্দেশে মস্কোর কাছে সোভিয়েত গোয়েন্দা সংস্থাএনকেভিডির প্রশিক্ষণ মাঠ কমিউনারকায় তাঁকে ফায়ারিং স্কোয়াডে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। তবে ১৯৫৭সালে সোভিয়েত সুপ্রিম কোর্টের সামরিক কলেজিয়াম তাঁর বিচারকে ভুল বলে ঘোষণা করে এবং তাঁকে মরণোত্তর সম্মান প্রদান করে। এই বইয়ে লুহানীর লেখা বিভিন্ন প্রবন্ধ, প্রতিবেদন ও 'ইন্ডিয়া অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ল্ড রেভল্যুশন'থিসিসসহ অনেকগুলো চিঠি ও নথি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ ছাড়া রয়েছে ড. বিনায়ক সেনের একটিপ্রবন্ধ, লিওনিদ মিত্রোখিনের 'আ ট্রিপল ট্র্যাপ' নিবন্ধ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকএবং কমিন্টার্ন,বিশেষজ্ঞ ড. শোভনলাল দত্তগুপ্তের সঙ্গে মতিউর রহমানের একটি কথোপকথন। তাঁদের এই আলোচনায় সেই সময়ের বিপ্লবী, কমিন্টার্ন ও সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎসহ বিভিন্ন বিষয়েআলোকপাত করা হয়েছে।

লুহানীর দুর্লভ রঙিন ছবি, তাঁর স্ত্রী গ্যাব্রিয়েলের পোর্ট্রেট ও প্রতিকৃতি, বিভিন্ন শহরে তাঁদের বাসস্থানের ছবি এবং গুরুত্বপূর্ণ চিঠি যুক্ত করার মাধ্যমে বইটি আরও বেশি সমৃদ্ধ হয়েছে। এই বই থেকে একজন বাঙালি বিপ্লবীর করুণ পরিণতি সম্পর্কে যেমন জানা যায়, তেমনি বিচরণ করা যায় ইতিহাসের এক নির্দিষ্ট কালপর্বে, যার প্রভাব আজও ছড়িয়ে আছে আমাদের সমাজ, রাজনীতির নানা স্তরে। নিঃসন্দেহে এই বই ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। ❐

প্রথম আলো (১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫) থেকে পুনর্মুদ্রিত।

গল্প

বড্ড চেনা চেনা

শঙ্কর দেবনাথ

একেবারে সদর দরজায় মুখ থুবড়ে পড়ে আছে লোকটা। চেনার উপায় নেই। কারণ নিজের মুখটাকে সে কংক্রিটের সঙ্গে বিচ্ছিরি ভাবে গুঁজে রেখেছেয়। উঁকি-ঝুঁকি হাঁক-ডাক। লোকটা নির্বিকার। নিথর। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, কি তার চেয়ে একটু বেশী। বেশভূষা ময়লা, তবে ভিখিরী বা পাগল বলে তো মনে হচ্ছেনা।

আশপাশের জানলা,দরজা,রেলিং, ঝুলবারান্দা আর ছাদের কার্নিশে কার্নিশে দু চারটে মুখ। টুকরোটুকরো কথা। আহা, উহু, দুঃখ, আবেগ, সহানুভূতি এই সব আরকি। লোকটার মৃত্যুর কারণ খুঁজলো কেউকেউ। খুন, আত্মঘাতী, অনাহার, নাকি করোনার শিকার, এই নিয়ে খানিক কথা লোফালুফি। সবই ওপর ওপর। আপাতত মৃত্যু আতঙ্ক চারপাশে। দুটো জ্যান্ত মানুষ মুখোমুখি হলেও যেখানে এ-ওর থেকে দশ হাত দূরে ছিটকে যাচ্ছে, সেখানে বেওয়ারিশ লাশ বলে কথা। কেউ ত্রিসীমানায় ভিড়বে না, এটাই বাস্তব। আপাতত রজত একলাই নিচে। লাশ থেকে ফুট আষ্টেক দূরে।

দুচারটে কথার পরে মৃত মানুষটিকে নিয়ে আর কারও কোনো আগ্রহ দেখা গেল না। থেমে যাওয়া একটামানুষকে ঘিরে বেশিক্ষন আহা-উহু, পুতুপুতু, নাগরিক সভ্যতার স্বভাব বিরুদ্ধ। আলোচনা বইছে এখন অন্য খাতে।

এই অনন্ত অবসরে ঘরে ঘরে জ্ঞানের বারুদ তো কিছু কম জমেনি! নিজ নিজ তথ্য ভান্ডার নিয়ে তাইবোমা ছোড়াছুড়ি খেলা।

এই আলোচনার বিন্দুমাত্র রজতের কানে ঢুকছে না। তার মাথায় এখন অন্য চিন্তা। লোকটা তো গাড়িবার করার জায়গাটুকু পর্যন্ত রাখেনি। এদিকে সকাল নয়টায় ক্লায়েন্ট মিটিং। টানা দুমাস কসরত করেআজ ঘন্টা খানেক সময় আদায় করা গেছে।

মোকামবেল ভেড়ির মালিক। ডিল পছন্দ হলে মোটা টাকা ইনভেস্ট করবে কথা দিয়েছে। কিন্তু এখন তোকূলে এসে তরী ডোবার অবস্থা। মোকামবেল ব্যস্ত মানুষ। আজকের মিটিংটা ভেস্তে গেলে আর হয়তোফোনই ধরবেন না।

এদিকে রজতের এ মাসের টার্গেট ও এখনো ফুলফিল্ড হয় নি। ব্রাঞ্চেও একবার নাগেলেই নয়। সেখানে নাকি একটা মোটা টাকার গরমিল দেখা গিয়েছে। অথচ রজত গতকাল ছুটির পর তিনতিন বার ক্রস চেক করে হিসেব মিলিয়ে রেখে এসেছে। তার পরেও এটা হয় কি করে?

কাল রাতে ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের ফোন পাওয়ার পর থেকে মেজাজ টা এমনিতেই চটকে আছে। তার মধ্যেএই উটকো ঝামেলা। কারই বা মাথার ঠিক থাকে!

ওপরের আলোচনা এখন দেশ, কাল, ভবিষ্যৎ, করোনা, মহামারী, পরিযায়ী শ্রমিক, সরকার,মিথ্যাচার, বেকারত্ব, হাহাকার, বিজ্ঞান, জ্যোতিষির নিদান, খনার বচন, ভগবান, গোমূত্র সেবন এইসবনিয়ে।

আলোচনায় মানবেন্দ্রবাবু বিশেষ সুবিধে করতে পারছেন না। বয়সটাই বোধহয় বড়ো অন্তরায়। বুড়োহাবড়াদের কথা কেইবা মন দিয়ে শোনে। তাছাড়া ওঁনার একটু টানের দোষ, মুখে নাখোশ, গলাও পৌঁছচ্ছে নাততটা। তিনি অপলক চেয়ে আছেন মড়াটার দিকে। রজতের অস্থিরতা বারান্দার এমাথা-ওমাথায়। কাকে যেন ফোনে ধরার চেষ্টায় আছে। হঠাৎ একটাচিৎকার ভেসে এল।

— নড়ছে, নড়ছে।

সব শব্দ মুহূর্তে স্তব্ধ। জোড়া জোড়া চোখ ঘোরে নিথর শরীরে।উল্টো দিকের ঝুলবারান্দা থেকে অলোক টিপ্পনি ছুড়ে দিল, — কী নড়ছে? ভূত দেখছেন নাকি?ফেঁসে যাওয়া তবলার মতো ন্যাতানো শব্দ বাতাসে ভাসল, — না, আমি পষ্ট দেখলাম। একটু যেন নড়েউঠলো। ওকি সত্যিই মরেছে?

সুরেশ আর এঞ্জেলা পুবদিকের ছাদে। সুরেশের বরাবরই লঘুগুরু জ্ঞান কম, — সাত সকালে গাঁজাফাঁজা টেনেছেন নাকি। বেঁচে থাকলে কি আর এই লক ডাউনের বাজারে রাস্তার উপর ঘাপটি মেরে পড়ে থাকে? পুলিশ এখন হেব্বি তেতে আছে। ফেসবুকে দেখছেন না? যাকে সামনে পাচ্ছে ধুনে দিচ্ছে একেবারে। পশ্চিমের ঝুলবারান্দা থেকে সঞ্জয় বলল, — আচ্ছা এক লাঠি দিয়ে যে এত জনকে প্যাঁদাছে,লাঠিওতো স্যানেটাইজ করতে দেখছি না। ওখান থেকেই তো রোগ ছড়াতে পারে? এ কথাটা মাথায় এলো নাওদের?

এই সব অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্তায় রজত খুবই বিরক্ত। কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারছে না। এমনিতেইনতুন পাড়া। তাছাড়া অহেতুক বাক্যব্যয় তার স্বভাব বিরুদ্ধ।

রজতের অস্থিরতা ক্রমেই বাড়ছে। দমদম থেকে খড়িবাড়ি দূরত্ব কম নয়। নির্ধারিত সময়ে পৌঁছতেগেলে এক্ষুনি বেরিয়ে পড়া দরকার। ইতিমধ্যে সে দুবার থানায় ফোন করেছে। এখনো কারও টিকিটিও দেখাযাচ্ছে না। চারদিকে যেভাবে মড়ক লেগেছে তাতে সহজে কেউ এ পথ মাড়াবে বলে মনে হচ্ছে না। বেওয়ারিশ লাশ সরানো তো দূরের কথা।

জীবনের পড়ন্ত বেলায় মানুষ বোধহয় পাথরেও প্রাণ খুঁজে বেড়ায়। মানবেন্দ্র তাই নিথর শরীরে ফিরেফিরে প্রাণের ইঙ্গিত পাচ্ছে, ;হাতের কাছে মোটা বাঁশ ফাঁস কিছু নেই? একটু নেড়েচেড়ে দেখুন না। আমারকেন যেন মনে হচ্ছে ও মরেনি।

— খবরদার, উম, বুদ্ধির ঢেঁকি একেবারে। কিসে না কিসে মরেছে বলা যায়? ভাইরাস এখন বাতাসেও ছড়াচ্ছে। শেষে দেখা গেল গোটা পাড়া একেবারে গাধার গাঁড়ে চলে গেছে।

সুরেশের বেলাগাম কথা শুনে এঞ্জেলা কানমুলে দেয়।

সতীশের ছেলে টুবলু সবে হাই তুলতে তুলতে বাবার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। লাবণ্য তাকে ছোঁ মেরে ঘরেনিয়ে গিয়ে পড়তে বসিয়ে দিল।

উত্তরে জানলা বলে ওঠে, — আপনার কী আজ না বেরোলেই নয়?

পশ্চিমের ঝুলবারান্দা থেকে আসে প্রতিউত্তর, — ওনার কি আর আপনার মতো কপাল? ব্যাংকেরচাকরি। জীবন বাজী রেখে বেরোতে হচ্ছে।নেহাতই খোঁচা মারা কথা। এতে যে সহানুভূতির লেশ মাত্র নেই রজতের বুঝতে অসুবিধে হলো না।গরাদ জানলা বলে ওঠে,— গাড়ি ছাড়া যাবেন কি করে ! দমদম টু কাজীপাড়া, এতটা রাস্তা! আমারসাইকেলটা আছে, তাতে কি কিছু,

— কী? সাইকেলে করে কাজী পাড়া? ডিস্টেন্স জানেন? তার চেয়ে বড়ো কথা ওটা মোল্লাদের এরিয়া। পিল পিল করছে একেবারে। গায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়বে। ক-অক্ষর গোমাংস সব।

সুরেশের কথাটা খট করে কানে লাগে রজতের। ওর কথা পুরোপুরি মিথ্যে নয়। ও অঞ্চলে লিখতে পড়তে জানা লোকের সংখ্যা সত্যিই কম। বেশিরভাগ লোককে তো টিপসইটাও হাতে ধরে করিয়ে দিতে হয়। ভরেদিতে হয় চেক, উইথড্রল স্লিপ, ডিপোজিট স্লিপ। প্রত্যেক কাস্টমারের নামে এটিএম ইস্যু করা হয়েছে,কিন্তু তার ব্যবহার তারা জানেনা, শেখারও কোনো আগ্রহ নেই। দুশো টাকা ফেলতে বা তুলতে এই লকডাউনের বাজারেও তাঁদের প্রতিদিন ব্যাংকে আসা চাই।

সোশ্যাল ডিস্টেন্সিঙের তো বালাই নেই। মাস্ক দূরের কথা, বোতল বোতল হ্যান্ড স্যানিটাইজার রাখাআছে, মাথা খুঁড়ে মরে গেলেও কেউ তা ব্যবহার করছে না। বিরক্তির শেষ কথা, রজতের মতো ঠান্ডা মাথারমানুষও মেজাজ হারিয়ে ফেলে মাঝে মাঝে। এসবের মধ্যে থেকে বাড়ি ফিরে তিনবার স্নান করলেও গাঘিনঘিনে ব্যাপারটা থেকেই যায়। সারাক্ষণ একটা আতঙ্ক। উন্নত দেশগুলোই শুয়ে পড়ছে, এখানে মড়কলাগলে তো আর দেখতে হবে না। সরকারের যা ঢিলেঢালা ব্যবস্থা সেসব শুনলে পিলে চমকে যায়। নানান কু-চিন্তায় রাতে ভালো ঘুম হয় না। বিকট সব স্বপ্নে হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যায়। গলা শুকিয়ে কাঠ।বোতল বোতল জল খেলেও তৃষ্ণা মেটে না। উল্টে ঘন ঘন পেচ্ছাপ পায়। বাথরুম-ফাতরুম সেরে ঘুম এল কিএলো না অমনি এলার্ম বেজে ওঠে।

এতো কিছুর পরেও সুরেশের কথাটা রজতের মনে যেন শেল হয়ে গেঁথে গেল। কথায় মানুষ চেনা যায়।এই সমস্যা কি শুধু কাজী পাড়ার? পশ্চিম বঙ্গের অধিকাংশ গ্রামেরই তো একই অবস্থা। একটি বিশেষসম্প্রদায়ের দিকে আঙুল তুলে যারা দায় এড়িয়ে যেতে চায়। তাঁদের শিক্ষা এবং রুচিবোধ নিয়ে তার যথেষ্টসন্দেহ আছে।

বছর দশেক আগেও রজত এই ধরণের কথা শুনলে তীব্র প্রতিবাদ করতো। এখন এড়িয়ে যায়।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায় লোক ও বেড়েছে কিছু। উঁকি-ঝুঁকি, মোবাইলে খচখচ ছবি। ধারালোহেড লাইন দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় খবরও করল বোধহয় কেউ কেউ। আলটপকা মন্তব্য এধার-ওধার মাস্কের ভিতর ভিতরে। দু চারটে চ্যাংড়া ছোকরা, ঘরে যাদের দুদণ্ড মন টেকে না। ফুলুক-ফালুক রাস্তায়বেরিয়ে পড়ে,আর পুলিশের গাড়ি দেখলেই গা ঢাকা দেয়,তারা একটা কাজের কাজ পেয়েছে। কোত্থেকে বাঁশফাঁস জোগাড় করে এনেছে। মরা কুকুর বেড়ালের মতো রাস্তায় মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা মানুষটাকে সরানোরচেষ্টা করছে। একজন বাধা দিতেই একটা কুড়ি বাইশ বছরের ছেলে খিঁচিয়ে উঠলো,

—ব্যালকনিতে বসে চা প্যাঁদাচ্ছেন প্যাঁদান না, লেকচার দিচ্ছেন কেন? পুলিশ, কর্পোরেশন কখনআসবে তার কোনো ঠিক আছে? বডিটা একটু সাইড করে না দিলে ভদ্দরলোকের গাড়িটা বেরোবে কী করেসেটা ভেবেছেন? ফুট দশকের ওপর লম্বা বাঁশ, মুখে মাস্ক, হাতে গ্লাভস পরে আছি, আপনার অসুবিধেকোথায়?

কে যেন বলে উঠলো,

— এই বুদ্ধিটা আমি অনেক আগেই দিয়েছিলাম। আমার কথায় কেউ পাত্তাই দেয়নি।মানবেন্দ্র তেড়ে উঠলেন।

— তুমি আবার বললে কখন ! বললাম তো আমি। ইতিমধ্যে খোঁচাখুঁচি করে লাশটাকে উল্টে ফেলা গেছে। ঝন্টু লোকটার মুখটা দেখেই বলল,;আরে এই মালটাই তো পরশু পটলার দোকানে মোবাইল রিচার্জ করতে গেছিল, সে কী বাওয়াল।

— কেন, বাওয়াল কেন?

— দশটাকা রিচার্জ করানোর জন্যে কেউ দুহাজার টাকার নোট ভাঙিয়ে দেয়? পটলাও দেবেনা,এদিকে ও নাছোড় বান্দা, শেষে পটলা ঝাঁপ ফেলে দিল,

— সেকি। নাম কি। কোথায় থাকে। কোত্থেকে এল। সে সব না জেনেই ঝাঁপ ফেলে দিল?

— বলছিল তো দূরে কোথায়।

একটা থাকে, কাজে এসে লক ডাউনের ফেঁসে গেছে, মোবাইলেও আর টাকা নেই, বাড়ীর সাথে যোগাযোগনেই, সে একেবারে হাতেপায়ে ধরাধরি। বৃষ্টিতে ভিজে নাকি জ্বর বাঁধিয়েছে, আমি দেখলাম হওয়া খারাপ,আস্তে করে পাতলা হয়ে গেলাম। ওসব ঝামেলায় জড়ায় কেউ?

—এটা কোনো কথা হলো! বাইরের একটা লোক এলাকার মধ্যে খুল্লামখুল্লা ঘুরে বেড়াচ্ছে, ভালো করেজানতে হবে না?

— ঠিকইতো, এরাই তো রোগ বয়ে বয়ে আনছে। দেখা মাত্র ধরে কোয়ারেন্টাইনে পাঠানোর ব্যবস্থাকরাই ছিল বুদ্ধিমানের কাজ।

— এর সাথে কিন্তু আরও একজন ছিল, বেশ জোয়ান তাগড়া, সে মালটা গেল কথায়?

— দেখো গিয়ে স্কৌ৩৯;ই খুন করে ওই দুহাজার টাকা নিয়ে চম্পট দিয়েছে।

— খুন হলেতো রক্ত থাকতো।

— গলা টিপে মেরেছে হয়তো।

—সব্বোনাশ, সে আবার কোথায় কোথায় ঘুরছে, ক'লক্ষ লোকের মধ্যে রোগ ছড়াচ্ছে, ভগবান জানে!

— ও অলক, তোমার তো শুনি উপর মহলে খুব যোগাযোগ। একটু কথা চালাচালি করে দেখোনা, লাশ সরিয়ে গোটা পাড়াটাকে একটু স্যানেটাইজ করানো যায় কিনা। না হলে তো ওই পথে বাজারেও যাওয়া যাবে না।

অবশেষে এই অবান্তর কথকতার অবসান হলো। দেরিতে হলেও থানা আর কর্পোরেশনের লোক এসেবডিটা তুলি নিয়ে গেছে। ঘটনাস্থল এবং আশপাশ স্যানেটাইজ করে দিয়ে গেছে। এলাকা এখন শান্ত। সোশ্যাল মিডিয়া দৌলতে সব খবর মুহূর্তে রাষ্ট্র হয়ে গেছে। রজতকেও আজ আর বেরোতে হচ্ছে না।

ব্রাঞ্চ ম্যানেজার নিজেই ফোন করে জানিয়েছেন। টাকার হিসেবটাও মিলে গেছে। মোকামবেলও সবশুনেটুনে আর একটা ডেট দিয়েছে। বারান্দার সোফায় গা টা এলিয়ে দিয়ে রজত একটা স্বস্তির নিঃশাসছাড়লো। মাথার উপর থেকে যেন একটা কুইন্টালের বস্তা নেমে গেলো তার। এতো সহজে যে লাশটার গতিহবে একটু আগেও কি সে ভাবতে পেরেছিলো! চোখ বুজে ভগবান আর রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে খানিক ধন্যবাদজানাল রজত। বন্ধ চোখেই ভাবল, চারপাশটা ততটা খারাপ নয়। নিন্দুকেরা একটু বেশীই রটায়। অ্যান্টিএস্টাব্লিশমেট এক ধরণের ফ্যাশন।

এর বেশি কিছু আর ভাবতে চাইল না রজত। এরকমটা ভাবলেই ভালো থাকা যায়। শরীর মন হালকা হয়। খানিকটা দায়ও এড়ানো যায় বোধহয়।

বাইরের জামা কাপড় কেচে, সাবান শ্যাম্পু মেখে ভালো করে স্নান সেরে নিলো রজত। আর সবার মতোতারও আজ অনন্ত অবসর। চার পিস পাউরুটি একটা ডিমের পোচ আর ব্ল্যাক কফি সহযোগে ঝটপটব্রেকফাস্ট সেরে নিল আগে। এখন সে ঠান্ডা মাথায় সেঁজুতিকে ফোন করে সবটা জানাবে। ছেলেটার সঙ্গেওঅনেক দিন ভালো করে কথা হয়নি।কথাটা ভাবা মাত্রই সেঁজুতির ফোন এলো।ব্যাপার টা কী? এই রকম একটা সাংঘাতিক কান্ড, সেটা আমাকে ফেসবুক থেকে জানতে হচ্ছে! একটাফোন করার সময় হোলোনা?

— করেছিলাম, ফোন তো সুইচ অফ ছিল। তুমিতো এতো সকালে ওঠো না।

— উঠোবো কি? কটায় শুতে যাচ্ছি দেখো! এখানে খুব যেন আরামে আছি আমি? বাসন্তীকেও তো ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তার পাঁচ বাড়ি ঘুরে কাজ, বাড়িতে একটা আধ মরা লোক, কোত্থেকে কি বয়ে আনে বলা যায়? এমনিতেই তো বাবা খালি বলছে, 'এই লকডাউনেই বোধহয় মরে যাবো। ক্যাথিটার পাল্টানো হচ্ছে না, কোনো চেক আপ নেই।' বাচ্ছা ছেলেরও অধম হয়ে যাচ্ছে দিন দিন, এখন মাথা খুঁড়ে মরে গেলেওযে কোনো ডাক্তার পাওয়া যাবে না, সেটা বুঝলে তো? তার মধ্যে বাবানের অনলাইন ক্লাস, এক গাদা হোমটাস্ক। সব সেরেসুরে, রাত দেড়টার আগে তো বিছানাতেই যেতে পারছি না। ঝি-চাকরের থেকেও খারাপঅবস্থা এখন আমার।

সেঁজুতি প্রায় এক নিঃশ্বাসে বলে গেল কথা গুলো। এটা ওর এক অদ্ভুত প্রতিভা। ওর সঙ্গে ফোনে কথাবলার এই এক সুবিধে। বিশেষ কিছু বলার দরকার পড়েনা। খালি ফোনটা ধরে থাকলেই চলে। একবারে অনেককথা বলে, হাঁপিয়ে গেলে দম নেয়, আবার বলে,

— বাবাও তো বলছে ঐ সঙ্গের লোকটাই মেইন কালপ্রিট, কী দিনকাল পড়লো ভাবো! দু হাজার টাকার জন্য খুন করে রেখে গেলো মানুষটাকে? আফটার কর না দেখ, মানুষ মানুষের মাংস ছিঁড়ে খাবে।কথায় কথায় সত্যজিৎ রায়ের ছবির প্রসঙ্গও এসে পড়লো।

—মনে নেই? সেই যে,মরা মানুষের মুখের সামনে থেকে খাবার নিয়ে নেয় বাচ্ছা মেয়েটা, কী যেন নামমুভিটার, আরে বলো না? ছবিরটার নাম রজত কিছুতেই মনে করতে পারল না। বলা ভালো চেষ্টাও করলো না।

খানিক পরে সেঁজুতিই লাফিয়ে উঠলো,

— ইয়েস, মনে পড়েছে, অশনিসংকেত, যুদ্ধের সময়েই যদি ওই হয়, তাহলে মহামারির পরকি হাহাকার হবে বুঝতে পারছো?

সেঁজুতির কথা শেষ হলে রজত বাবানের সঙ্গে অনেক গল্প করলো। শ্বশুর মশাইয়ের সঙ্গে সেরে নিলকুশল বিনিময়। ভীষণ ক্লান্ত লাগছে এবার। মানসিক চাপ শরীরকে বেশি ক্লান্ত করে। কিংবা অনেক ঘুমজমে আছে বোধহয়। শরীর ছেড়ে দেবার এটাও একটা কারণ হতে পারে।

২

ধরে যাওয়া ভাতের গন্ধে তন্দ্রা কেটে গেলো রজতের। বাইরে একটা অচেনা নিস্তেজ গলা কি যেনবলতে চায়। রজত তড়িঘড়ি গ্যাস টা বন্ধ করলো আগে। বাইরের বিষন্ন গেঁয়ো গলাটা নাগাড়ে ডেকেচলেছে,

— দাদা, ও দাদা, বাড়িতে কেউ আছেন? ও দিদি, দরজাটা এট্টু খোলেন না, করুণ, অসহায় সে ডাকে কীযে আর্তি, তা বলে বোঝানো যাবে না।

জানলার কাছে এসে পর্দাটা কিঞ্চিৎ সরালো রজত। সদর দরজার ওপাশে বাইশ-তেইশ বছরের একটাছেলে। ময়লা পোশাক, হালকা পাতলা গ্রাম্য চেহারা। মুখে চোখে অদ্ভুত সারল্য। কাঁধে একটা সস্তা ছেড়া-ময়লা ব্যাগ। ভীষণ বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে তাকে।

বাইরের ঝাঁঝালো আলো ছেলেটার চোখেমুখে। পর্দার ঐটুকু ফাঁকা দিয়ে ঘরের ভিতরে কিছু দেখাও গেলনা সেভাবে। তবু পর্দা একটু সরতেই ছেলেটা বুকে যেন বল পেলো খানিকটা,

—বলতিছি, এইদিক এট্টা লোকরে দেখিছেন আপনারায? রোগা, কালো, মুখ ভরা কাঁচা-পাকা দাড়ি, এট্টাতেজপাতা রঙ্গের পাঞ্জাবী গায়, সকালে এই হেনে তারে বসায়ে রাইহে গিছি, এহন আইসে দেখি মানুষটানেই, খুব বেশিদূর যে যাবে, সে বলওতো তার গায় নেই, কুতায় গেলো মানুষটা ! আপনারা কী তারে দেখিছেন?

এই কটা কথা সে বলল অতি কষ্টে। শিকারীর গুলি খেয়ে ডানা ভেঙে পড়া পরিযায়ী পাখির মতো।

বাইরে তখন ক্লান্তিহীন কোকিলের ডাক, শালিখের কিচির মিরির,কুকুরের ঝগড়া, পায়রার বকবকম, বিদ্যুতের তারে বসে থাকা নিঃসঙ্গ ফিঙে। পাড়া এখন সুনসান। বাজারের মাইক থেকে ভেসে আসছে ভাইরাস সংক্রান্ত সতর্ক বাণী, সতীশের ঘরে লো-ভলিউমে চলছে পন্ডিত যশরাজের বিলম্বিত, সুরেশের ঘরেকিশোর কুমার, মানবেন্দ্রর বাড়িতে হনূমান চল্লিসা, কোত্থেকে যেন ভেসে আসছে গায়ত্রী মন্ত্র।

আলোকের টিভিতে পৃথিবীর খবর, একটু জোরে। হাজারো শধের মধ্য থেকে একটিকে আলাদা করে শুনতেপারার সহজাত ক্ষমতা যদি মানুষের না থাকতো, তাহলে বোধহয় রজত ছেলেটার কথা গুলো শুনতেই পেতনা।

রজত ভাবলো এই কী সে, একটু আগেই সবাই যাকে খুনি, ছিনতাইবাজ হিসেবে ধরে নিয়েছিল? কই ঝন্টুযে বলল তার তাগড়াই চেহারা !রজতের খটকা লাগে।

একটা মানুষ কে খতম করে, তার সর্বস্ব হাতিয়ে যদি কেউ পালিয়েই যাবে, তাহলে আবার তার খোঁজেআসা কেন?

ছেলেটিকে এক কথায় কাটিয়ে দিতে ইচ্ছে করল না রজতের। তাছাড়া ভূমিকাহীন একটা মৃত্যু সংবাদ দুমকরে দেওয়াও তো যায় না। ঘরের ভিতর থেকেই সে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল

— উনি কে হন তোমার? কোথায় থাকো? কি নাম ?

— আমার না মহাদেব। আকরম কাহা আর আমি এক গিরামে থাকি। বিনাপোল বডারের কাছে।ছেলেটা ভীষণ হাঁপাচ্ছে,

—এট্টু খাবার জল দিতি পারেন বাবু। পিরায় মাইল তিনিক রাস্তা ছুইটে আইসি তো। গলা শুকোয়েঅসতিছে।

ঘর থেকেই দুচার কথায় একটু বাজিয়ে দেখে,ছেলেটিকে রাস্তা থেকেই ভাগিয়ে দেবার ইচ্ছে ছিলরজতের। কিন্তু কেউ জল চাইলে তো আর না করা যায় না।

সে একটা দু'লিটারের লিমকার বোতল ভরা জল এনে গেটের এপারে রাখলো। মহাদেব গেটের ওপার থেকে ছোঁ মেরে বোতলটা তুলে নিয়ে কোৎ কোৎ শধে একবারে লিটার খানেক জল নামিয়ে দিল। বোতলটাফিরিয়ে দিতে গেলে রজত বলল,

— ওটা রাখো তোমার কাছে।

কথায় কথায় জানা গেল, মহাদেব আর আকরম পেশায় রাজমিস্ত্রি। আরামবাগে একটা বহুতলনির্মাণের কাজে গিয়েছিলো দুজনে। সঙ্গে নানা জায়গা থেকে আসা মিস্ত্রি,লেবার মিলিয়ে, আরও প্রায়জনাবিশেক লোক ছিল। হঠাৎ লকডাউনের এই ফস্কা গেরোয় আটকে পড়ে সবাই। প্রথমে ভেবেছিল এ আর কদ্দিন? দিন কতক পর আবার সব স্বাভাবিক হয়ে যাবে। কিন্তু পরে দফায় দফায় যখন লকডাউন বাড়তে থাকে। আইন কঠিন হয়। তখন হয় বিপত্তি। একে তো বাইরের লোক, তার উপরে একঘরে এতজন গাদাগাদি করে থাকছে। বাজার ঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শেষে এলাকার লোকেরাই থানায় নালিশ করে। পুলিশএসে এক ঘন্টার মধ্যে ঘর ফাঁকা করে দিতে বলে। ঠিকাদারও আর কোনো দায়িত্ব নেয় না। গতর খাটনিরপূর্ণ পারিশ্রমিক ও দেওয়া হয়নি তাঁদের। জনে-জনে যৎসামান্য হাতে গুঁজে দিয়ে কোনও মতে দায়সেরেছে। তার পর

থেকে প্রায় এক সপ্তাহের উপর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে কাটিয়েছে। পুলিশের ব্যাটন ওকম জোটেনি তাদের কপালে। এক সময় ছত্র ভঙ্গ হয়ে যায় দলটা। ছড়িয়ে পড়ে এদিকে-সেদিকে যে যারমতন। কেবল মহাদেব আর আক্রম রয়ে গেছে একত্রে। মালিক এক অদ্ভুত সুতোয় বেঁধে দিয়েছে দুজনকে। ভাংতি না থাকার অজুহাতে দুহাজার টাকার একটা নোট ধরিয়ে বলেছিলো ভাগাভাগি করে নিতে। সে টাকাতারা আজও ভাঙিয়ে উঠতে পারেনি।

আরামবাগ থেকে তারা যে কিভাবে দমদম এল, সে এক ইতিহাস। কলকাতায় পুলিশি প্রহরা আরও বেশী। সদর রাস্তায় থাকার হাজার ঝক্কি। তাই এক জায়গায় না থেকে অলি-গলি এধার-ওধার ঘুরছিল তারা। কালরাতে রজতের গ্যারেজের শেডের নিচে কোনোরকমে রাত কাটিয়েছে দুজনে। এমনকি পটলার দোকানেরঘটনাটাও সত্যি।

ছেলেটাকে দেখে একটু মায়া হলো রজতের। নাকি নেহাতই ভদ্রতার খাতিরে বলল বোঝা গেল না,

—খাবে কিছু?

— না বাবু খাবার আছে আমার ব্যাগে। সেই সকাল ছয়টায় লাইনি দাঁড়ায় এই নিয়ে আসলাম। বাবুরা তোএক জনরে দুজনের খাবার দিতি চায় না। তাছাড়া আমরা হলাম বাইরির লোক। সে পিরায় হাতে পায়ে পরতি,এট্টু বেশী করে দিসে। ওই ভাগ-যোগ করে খাবানে দুজনে এবেলার মতোন।রজত শুনেছে আশপাশের মধ্যে সেই মতিঝিলের কাছাকাছি একটা কমিউনিটি কিচেন খুলেছে। সে জানতেচাইল,

—ওঁকেও নিয়ে গেলে না কেন?

— ডাইকে তুলতি পারলাম নাতো। গায় ধুম জ্বর। ওদিক আবার ভোর ভোর লাইন না দিলি খাবার শেষ হয়ে যাওয়ার ভয়। কাইল দুফুরি একবার লম্বা লাইন দিয়ে, দোর গুড়ায় আইসে শুনি সব শেষ। সারাদিন পেটেগামছা বাইন্দে পইড়ে থাকলাম দুইজনে। রজত একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেলো। কেন কে জানে!

— বাবু, দেহিছেন তারে, কোনদিক গেছে এট্টু বলবেন? দেখি খুঁজে পাই কিনা।

রজত চরম সত্যিটা বলার ভাষা হাতড়ে বেড়ায় নিজের ভিতরে। যে গেছে সে তো আর ফিরবে না। কিন্তু যেআছে তাকে তো বাঁচানো দরকার। সব শোনার পর,সে কী আর কিছু মুখে তুলতে পারবে? রজত বলল,

— সে ভালো আছে। তুমি একটু সামান্য কিছু মুখে দাও দেখি, দাঁড়াও নিয়ে আসি।

— না বাবু, আগে আকরম কাহা'র পেটে কিছু পড়া দরকার। তারে না খাওয়ায়ে আমি কিছু মুহি তুলতি পারবোনানে।

ছেলেটির বলার ধরণে শুধু মনুষ্যত্বই নয়, মৃত লোকটির প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতা বোধও প্রকাশ পেল।রজতের ভিতরে মানুষটা এবারে বোধয় সত্যিই কেঁদে ফেললো। বাইরে যদিও তার চিহ্ন মাত্র প্রকাশপেল না। সে কান্না গিলতে শিখে গেছে অনেক আগেই। বাস্তব বুদ্ধি দিয়ে আবেগ দমন করতে হয়। সব শুনেটুনে মহাদেকে খুনি মনে হচ্ছেনা ঠিকই। কিন্তু সে কি সময়ের তুলনায় একটু অতি মাত্রায় ভালো মানুষনয়? বলা যায়না,হয়তো এটাকেই হাতিয়ার করে এই সব কুকর্ম করে বেড়াচ্ছে! কাজেই ঝামেলা হাটাও।সব শুনেটুনে পুলিশ ঠিক করুক তাকে কোয়ারেন্টাইনে পাঠাবে নাকি লকআপে। রজত আর কথা বাড়ালো না। আকরম যে বেঁচে নেই, মহাদেব যে আর কোনোদিনই তার বয়ে আনা খাবার আক্রমকে খাওয়াতে পারবেনা। সে কথাও খোলসা করল না। শুধু থানার রাস্তাটা বাতলে দিলো মহাদেব কে।জলের বোতল টা ব্যাগে রাখতে রাখতে মহাদেব বলল, —বাবু আপনারে বড্ডো চিনা চিনা লাগদিচ্ছে। কুথায় যেন দেহিছি ঠিক মনে কত্তি পারতিছিনে। অনেকক্ষুণ ধইরে বলবো ভাবদিছি। কিন্তুক সাহস পাইনি।

রজত কথাটায় খুব একটা আমল দিলনা। তার বদলির চাকরি। নানা জায়গায় ঘুরতে হয়। বেনাপোলা ব্রাঞ্চেও সে মাস ছয়েক ছিল একসময়। সেই ব্রাঞ্চেই হয়তো মহাদেবেরও একাউন্ট ছিল। সব মুখ কী মনে থাকে! মালদার কাস্টমার হলে আলাদা ব্যাপার। কথাটাকে শহুরে ব্যক্তিত্বে সুন্দর এড়িয়েগেলো সে।

মহাদেব অনুরোধ করলো, 'বাবু আমারে এট্টা ফোন করতি দেবেন? গিরামে এট্টা ফোন করবো, আকরমকাহা'র ভাই মনিরুল কাহা বলিলো পঞ্চায়েতের সঙ্গে কথা বলে আমাগো নিয়ে যাওয়ার এট্টা ব্যবস্থাকরবে। কী হইলো না হইলো এট্টু জানা দরকার। কাহা'র শরিলির যে এই অবস্থা, সে খবরও তো দিতিপারিনি, আমার মুবাইলি তো ফয়সা ও নেই, চার্জ ও ফতুর।'

রজত এবারে একটু বিপদে পড়ে গেল। এতক্ষণ তবু দূরে দূরে কথা হচ্ছিলো। এবার তো ঘাড়ের উপর এসেপড়ছে। যা কেস হিস্ট্রি তাতে ওর হাতে ফোন দেবার প্রশ্নই ওঠে না। আকরম যদি করোনায় মারা গিয়ে থাকে তাহলে মহাদেব নিঃসন্দেহে পজেটিভ। এক্ষুনি তাকে বিদেয় করা দরকার। তাছাড়া অচেনা-অজানা লোককে দুম করে ফোন ব্যবহার করতে দেওয়াটাও বিপজ্জনক।ঠান্ডা মাথায় কিভাবে পরিস্থিতি সামাল দিতে হয়, কোন প্রসঙ্গ কিভাবে এড়িয়ে যেতে হয়, তা রজতের নখদর্পনে।

— তুমি থানায় গিয়ে ওদের কে সব খুলে বলো, ওরা নিশ্চিত তোমাদের বাড়ি পৌঁছে দেবার একটা কিছু ব্যবস্থা করবে। প্রয়োজনে ওরাই তোমাদের পঞ্চায়েত প্রধানের সঙ্গে যোগাযোগ করবে।

রজতের কথা শুনে মুহূর্তে কতকগুলো অভিব্যক্তি খেলে মহাদেবের মুখে। এ কদিনে পুলিশকে সে হাড়েহাড়ে চিনেছে। রজতও যে মিষ্টি কথায় তাকে খেদাতে চাইছে সেটাও বুঝলো বোধহয়। কিন্তু মুখে সেই সরলহাসি। সহজ-সরল মনে অতি সহজেই সত্যিটা ধরা পড়ে। কিন্তু সব সময় প্রকাশ করা চলে না। রজতকেও প্রথম দিকে এরকম অনেক শহুরে সভ্য লাথি হজম করতে হয়েছে হাসি মুখে। আস্তে আস্তে গা থেকে গেওগন্ধ উবে গেছে। হাসি মাপতে শিখেছে বহু কষ্টে। এখন সে আপাদমস্তক শহুরে। পিছনটাকে সেভাবে আরমনেও পড়ে না। আজ তার ছায়া পড়েছে সহজ সরল নিটোল জলে। মনের লজ্জা সামাল দিতে বলল, —আচ্ছা বেশ নম্বরটা বলো আমি স্পিকারে দিয়ে দিচ্ছি, কথা বলে নাও। নম্বরটা ডায়াল করে মোবাইলটা মহাদেবের দিকে খানিটা বাড়িয়ে ধরলো রজত। রাস্তা থেকেই উৎসুক কানটা বাড়িয়ে অতি কষ্টে ও প্রান্তের রিংটোন শুনতে পেলো মহাদেব। নিশ্চল সময়টা এ কদিনে এই প্রথম তার সহায় হয়েছে। গাড়িঘোড়া চললে তো কিছুশোনাই যেতো না। অধীর আগ্রহে কানটা বাড়িয়েই থাকলো সে। দুবার ডায়াল করার পরেও ও প্রান্তথেকে কোনো সাড়া মিললো না।

— থাইক বাবু, বুধয় কোনো কাজে আছে, মেলা দেরি হইয়ে গেছে, আমি যাই। দেহিগে বাবুগো হাতে পায়ধইরে, তেনাগো যদি দয়া হয়। এই রকম মুসিবতে পড়তি হবে, কোনো দিন কী ভাবিলাম। এরে কয় গ্রহেরফের। মাঝখান্দে আফনারও খানিক জ্বালাতন হইলো। মাফ করবেন বাবু।

চলে যেতে গিয়ে মহাদেব আবার ঘুরে দাঁড়ালো। মুখে চিন্তিত হাসি,

— আপনারে বড্ডো চিনা চিনা লাগদিছে, কুথায় যেন দেহিছি, কিছুতিই, যাগ্গে চলি বাবু।

যেন মনে করতে না পারার লজ্জায় নিজেকে দুষতে দুষতে চলে গেলো জলদি।

এপ্রিলের মাঝামাঝি কলকাতায় গরম মন্দ না। সকাল থেকে বাতাস ও থমকে আছে। বেলা বারোটার ঝাঁঝালো সূর্য মাথায় করে, একপেট খিদে নিয়ে মহাদেব চলে গেছে অনেক্ষণ। রজতের বাতলে দেওয়া পথেইতো গেল, তবু কেন তার চলে যাওয়া পথের দিকে চেয়ে আছে রজত! ভীষণ আনমনা দেখাচ্ছে তাকে। মহাদেবকী খানিকটা চিন্তা লেপ্টে দিয়ে গেলো তার মগজে! নাকি ঘাড় থেকে আরও একটা বোঝা নেমে যাওয়ায় স্বস্তির নিঃস্বাস নিচ্ছে সে? বোঝার উপায় নেই। দ্বিপ্রাহরিক বাড়িগুলোর দেয়ালে দেয়ালে খালি একটা প্রতিধ্বনি, 'বড্ডো চিনা চিনা লাগদিছে আফনারে, কুথায় যেন দেহিছি এর আগে!'❐

দেশের খবর

অসমের ছয় জনগোষ্ঠীর আন্দোলনের হাল হকিকত

কমলেশ গুপ্ত

ভারতের মতো বিশাল দেশের দুর্গম, প্রান্তিক অঞ্চলের জনসমষ্টির প্রতি উদাসীনতা, উপেক্ষা,অবজ্ঞার খবর কজন ই বা রাখে ! দুর্বল, সংখ্যালঘু, প্রান্তিক অঞ্চলের মানুষের আকাংখা, দাবি, সমস্যা, ক্ষোভের প্রতি সহমর্মিতা এবং সম্মান শাসক বিজেপির কস্মিনকালেও ছিল না, এখনো নেই। ক্ষমতা দখল এবং তা ধরে রাখার স্বার্থে প্রতিশ্রুতি, এবং উন্নয়নের স্বপ্ন দেখানোর জন্য যেটুকু খবর রাখা দরকার তাতেই তাদের কর্তব্য সীমিত। ২০১৬ সালে অসম বিধান সভার নির্বাচনে আগে বিজেপির অসম প্রাদেশিক কমিটির Assam Vision Document ২০১৬-২৫ দস্তাবেজে অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং সংবেদনশীল প্রতিশ্রুতিটি ছিল এক নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে অসমের ছয় জনগোষ্ঠীকে ষষ্ঠ তফশীল ভুক্ত করার মর্যাদা প্রদান করা হবে।নিশ্চিত করা হবে যাতে বর্তমানে তফশীল ভুক্ত জনগোষ্ঠীর সুবিধা সংকুচিত না হয়। বিজেপি অসমের প্রাচীন অধিবাসীদের 'জাতি, মাটি, বাসস্থান' সুরক্ষা দেয়ার পূর্ব শর্ত হিসেবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু নির্বাচনে জেতার পর সর্বানন্দ সোণোয়াল সরকার পাঁচ বছর এনিয়ে নিশ্চুপ রইলো।২০২১ সালের বিধান সভার নির্বাচনের ঠিক আগে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে একটি ক্যাবিনেট উপ- সমিতি গঠন করা হয়।হিমন্ত ঘোষণা করেন ২০২০ সালের ৩০ অক্টোবরের মধ্যে এই সমিতি রিপোর্ট দেবে।তার পর থেকে আজ পর্যন্ত সেই রিপোর্ট এলো না।

২০২১সালে জে পি নাড্ডা প্রকাশ করলেন অসমের 'সংকল্প পত্র'। সেই দস্তাবেজে , 'অসমের সভ্যতা সুরক্ষিত করা' (Protection of civilization of Assam) অধ্যায়ে ২০১৬ সালের প্রতিশ্রুতি টাই পুনঃ

ঘোষিত হলো এভাবে -- "We will undertake all necessary efforts to further take ahead the process to provide ST status to TaiéôéAhom–Koch Rajbongshi–chutia– teaéôéTribes– Moran and Matak Communities without hampering the existing reservations– rights and privileges of tribals in the state." ।

একুশ সালে শাসনে এলেন হিমন্ত । হিমন্তের শাসনকালে কি কি করা হলো দেখা যাক। প্রথম বছর এনিয়ে কিছুই করা হলোনা। পরিবর্তে ২০২১-২২ সালের বাজেট ভাষণে জনগোষ্ঠীগুলোর ঐতিহ্য -সংস্কৃতি সংরক্ষণের জন্য একটি বিভাগ শুরু করার প্রস্তাব দেয়া হলো।২০২২-২৩ সালের বাজেটেও তফশীল ভুক্ত করার কোন আভাস পাওয়া গেলনা। জনগোষ্ঠীগুলোর উন্নয়নের নামে কিছু টাকা বরাদ্দ করা হল। পরের দুবছর এই ছয় জনগোষ্ঠীর দীর্ঘ দিনের দাবির বিষয়ে কোনো প্রতিশ্রুতি বা ঘোষণাই করা হলোনা।

বাস্তব পরিস্থিতি জানা গেলো গত জুলাই মাসে(২০২৫)।যখন কংগ্রেস সাংসদ রকিবুল হুসেইন এবং প্রদ্যুৎ বরদলৈর প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রীয় জনজাতি পরিক্রমা দপ্তরের মন্ত্রনালয় জানালো যে তফশীল ভুক্ত করার জন্য অসম সরকার যে ক্যাবিনেট উপ-সমিতির গঠন করেছিল তাদের রিপোর্ট বিগত পাঁচ বছরে জমা হয়নি। এতো দিনেও রিপোর্ট দিতে না পারায় গত ১ সেপ্টেম্বর তারিখে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ক্যাবিনেট উপ-সমিতি নতুন করে গঠন করেছেন। জনজাতি পরিক্রমা দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী দুর্গাদাস উইকি সংসদে জানিয়েছেন ২০২৬ সালের নির্বাচনের আগে এই ছয় জনগোষ্ঠীর তফশীল ভুক্ত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই । অথচ ঘোষণা ছিল ২০২৫ সালের ১ মার্চ নবগঠিত উপ-সমিতি রিপোর্ট দেবে । আজ পর্যন্ত সেই রিপোর্ট জমা হবার খবর নেই।

প্রতিবার নির্বাচনের আগে এভাবে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় আর অসমের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীগুলো অসহায় ভাবে এই মিথ্যাচার মেনে নিতে বাধ্য হয়। এবারে রাজ্যের প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে বিক্ষোভের আগুন।জলন্ত মশাল মিছিল রাস্তার দখল নিচ্ছে। জনজাতি মানুষের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভ রয়েছে আর তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে দীর্ঘ দিন থেকেই।অতি সম্প্রতি (৮/১০/২৫) তিনসুকিয়াতে কম করে অর্ধ লক্ষাধিক চা শ্রমিক বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে ষষ্ঠ তফশিল ভুক্তির দাবিতে ।শাসকশ্রেণীর বিক্ষোভের নেতাদের ম্যানেজ করার পুরণো কৌশল চলছে তাল মিলিয়ে। মানুষের ক্ষোভের মুখে সেই কৌশল কতটা খাটে সেটাই দেখার।

অসমের এই প্রান্তিক মানুষগুলো নিজভূমে সামাজিক আর্থিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মুখে দাঁড়িয়ে সাংবিধানিক এবং রাজনৈতিক সুরক্ষা চাইছে।দেশের যে রাজনৈতিক দলএক দেশ এক ভাষা এক জাতি এক ধর্মের প্রবর্তন করতে চায় , বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সম্ভাবনা চাইবে না, এটাইতো স্বাভাবিক। এই সামাজিক দ্বন্দ্বের ফলে নির্বাচনে বিজেপির ক্ষতি হওয়াই স্বাভাবিক।

-----দুই -----

হাগ্রামা মহিলারি আবার বড়ো টেরিটোরিএল কাউন্সিলের প্রধান হিসেবে শপথ গ্রহণ করেছেন। ছমাস পরেই অসম বিধান সভার নির্বাচন। তার আগে এই স্বায়ত্তশাসিত পরিষদের নির্বাচনের ফলাফল অসমের ভবিষ্যত রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে এক গুরুত্বপূর্ণ বার্তা প্রেরণ করবে বলে রাজনৈতিক মহল মনে করছেন। একই সঙ্গে বিজেপির জন্যও এই ফলাফল এক বড় শিক্ষা।

৪০টি সমষ্টি বিশিষ্ট বি টি সি পরিষদীয় নির্বাচনে হাগ্রামার দল বিপিএফ পেয়েছে ২৮ পূর্বের শাসক ইউপিপিএল পায় মাত্র ৭ টি আসন।বিজেপি দল এবার বড়ো ভূমির শাসন ক্ষমতা দখল করার হুংকার দিয়ে মাত্র ৫ আসনে সীমিত রইলো। উল্লেখ্য যে গত নির্বাচনে বিজেপির জেতা আসন ছিল ৯ টি। হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সর্ব শক্তি নিয়ে নির্বাচনে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। বিটিসি বাসী ভোটার গেরুয়া বাহিনীকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

হাগ্রামা স্বভাবসুলভ খোলা মনের মানুষ।স্পষ্টবাদিতা, সরল কথনশৈলী শেকড়ের সাথে প্রোথিত থেকে জাতীয়তাবাদী কসরতই হাগ্রামার প্রতি জনতার প্রধান আকর্ষণ। এর সঙ্গে আছে বোড়োদের সাথে অন্যান্য জনগোষ্ঠী এবং সম্প্রদায়ের প্রতি তার সম-মনোভাব পোষন। ফলে হাগ্রামাকে সকল জনগোষ্ঠীর মানুষ সমর্থন করেছে। ট্রিপল ইঞ্জিন সরকার গঠনের হুংকার দেয়া বিজেপিকে এবং তাদের সহযোগী ইউপিপিএলকে এক প্রকারের উচ্ছেদ করেছে জনতা।

ইতিপূর্বে হাগ্রামা ১৭ বছর শাসন করে গত নির্বাচনে ইউপিপিএল-বিজেপি জোটের হাতে পরাজিত হন। প্রমোদ বড়োর নেতৃত্বে একটি জোট সরকার ক্ষমতায় আসে।এই জোট সরকার বিটিসির সার্বিক উন্নয়ন ও উত্তরণ ঘটাবে বলে জনসাধারণ আশা করেছিল। কিন্তু প্রমোদ বড়ো বিজেপির কোলে বসে জনগণের সেই আশাপূরণ করতে ব্যার্থ হয়। এদিকে বিজেপি নির্বাচনে প্রমোদ বোড়ো আর হাগ্রামার মধ্যে মেরু বিভাজন ঘটিয়ে বিটিসি দখল করার স্বপ্ন দেখেছিল। হাগ্রামার জয় এই গেরুয়া আগ্রাসন থেকে বিবিসিকে রক্ষা করেছে ।

অসমের বাকি জনগোষ্ঠী কি এই নির্বাচন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে? বর্তমান সময়ে অসমের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব রক্ষার আন্দোলন গভীর হয়েছে। অথচ জনগোষ্ঠীর দল-সংগঠন গুলো গেরুয়া বাহিনীর মোহিনী বাণে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। জন্ম দিয়েছে ছদ্মবেশী জাতীয়তাবাদের, মেরুদণ্ডহীন রাজনীতির।এরা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর স্বাধিকার তথা আত্মনিয়ন্ত্রণের আন্দোলনকে অবদমিত করে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর সংগ্রামী সত্তাকে স্তিমিত করে পরিচয় বিহীন করে তোলার পথ ধরেছে। অসমের প্রতিটি জনগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি সহ নিজস্ব পরিচিতি আছে। এই সব জনগোষ্ঠীর সম্প্রীতি ও সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে অসমিয়া জাতিসত্ত্বা এবং সংস্কৃতি। বিজেপির শাসনে শুধু অসম নয় উত্তর পূর্বাঞ্চলের জাতি জনগোষ্ঠীর স্বকীয় পরিচয়, সংস্কৃতি,ভাষা প্রভৃতি বিপদাপন্ন করবে একথা যতো দ্রুত জনগোষ্ঠী গুলো বুঝবে ততোই ভালো।হাগ্রামার বিজয় থেকে এই শিক্ষা গ্রহণ করা প্রয়োজন। ❐

বিহার বিধানসভা নির্বাচন এস.আই.আর, কাস্ট সমীকরণ ও গণতন্ত্রের দোটানা

সুকুমার মিত্র

বিহারের ২০২৫ সালের বিধানসভা নির্বাচন কেবল ২৪৩টি আসনের লড়াই নয়, এটি ভারতীয় গণতন্ত্রের এক জটিল পরীক্ষা। ৭.৪২ কোটি ভোটারের এই বিশাল নির্বাচনী রণক্ষেত্রে এসআইআর (Special Intensive Revision) প্রক্রিয়ায় প্রায় ৪৭ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ পড়ার গুরুতর অভিযোগ, চিরাচরিত জাতিগত সমীকরণ (কাস্ট সমীকরণ)-এর সূক্ষ্ম কৌশল এবং প্রশান্ত কিশোরের জন সুরাজ-এর মতো নতুন শক্তির উত্থান এক নজিরবিহীন পরিস্থিতি তৈরি করেছে। এনডিএ, মহাগঠবন্ধন এবং অন্যান্য 'স্পয়লার' দলগুলির মধ্যেকার এই নির্বাচনী যুদ্ধ নির্ধারণ করবে;বিহার কি আবারও চিরাচরিত জাতিভিত্তিক রাজনীতির পথে ফিরবে, নাকি তথাকথিত উন্নয়ন ও সুশাসনের নতুন দিশা দেখাবে।

এসআইআর ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া ৪৭ লক্ষ নাম। প্রশ্ন -প্রথমেই যে বিষয়টি গণতন্ত্রের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে, তা হলো এসআইআর প্রক্রিয়ায় প্রায় ৪৭ লক্ষ ভোটারের বাদ পড়া। জুন মাস থেকে শুরু হওয়া এই সংশোধনে ভোটার সংখ্যা ৭.৮৯ কোটি থেকে কমে ৭.৪২ কোটিতে দাঁড়িয়েছে। মহাগঠবন্ধন শিবির মনে করছে, এতে তাঁদের প্রধান মুসলিম-যাদব ভোটব্যাঙ্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তেজস্বী যাদবের দাবি, এই ৫ শতাংশ হ্রাস নির্বাচনের ফলাফলে গুরুতর প্রভাব ফেলতে পারে। যদিও এনডিএ এটিকে 'পরিষ্কারকরণ' বলে দাবি করছে, তবে সীমান্তবর্তী বিহারের মুসলিম এবং দক্ষিণের দলিত ভোটে এই বিভাজন তাদের সুবিধা দিতে পারে। তরুণ, মহিলা ও অভিবাসীদের অংশগ্রহণ কমে যাওয়ায় মোট টার্নআউট অর্থাৎ ভোট পড়ার প্রবণতা আরও কমার সম্ভাবনা রয়েছে, যা সাধারণত শহুরে এবং উচ্চবর্ণের ভোটারদের স্থিতিশীলতাকে সব সময় বাড়তি সুবিধা দেয়। সুপ্রিম কোর্টে এই এসআইআর প্রক্রিয়াকে চ্যালেঞ্জ করা হলেও, কমিশনের মতে, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের অভিযোগ গণতন্ত্রের ভিত্তিকে ঝুঁকিতে ফেলেছে। বিহারের এই নির্বাচন তাই বিজেপির সামনে তাদের মনের মত বৃহত্তর গণতান্ত্রিক সংস্কারের প্রথম পরীক্ষা।

নির্বাচনী মঞ্চের বিভাজন ও নতুন শক্তি

বিহারের রাজনীতিতে এখন মূলত তিন শক্তি মুখোমুখি;এনডিএ (বিজেপি, জেডিইউ, এলজেপি(আর), এইচএএম), মহাগঠবন্ধন (আরজেডি, কংগ্রেস, সিপিআই-এমএল, সিপিএম, সিপিআই) এবং জন সুরাজ। এআইএমআইএম-এর মতো ক্ষুদ্র দলগুলো এই লড়াইয়ে 'স্পয়লার' হয়ে উঠেছে। তবে এবারের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় জন সুরাজের উত্থান। প্রশান্ত কিশোরের নেতৃত্বে এই শক্তি চিরাচরিত জাতি-ভিত্তিক রাজনীতির উপর সরাসরি আঘাত হেনে উন্নয়ন ও সুশাসনের বার্তা দিয়েছে। এই নতুন গতিশীলতা জেডিইউ এবং বিজেপির ঐতিহ্যবাহী ভোটব্যাঙ্ককে টার্গেট করছে।

অঞ্চলভিত্তিক রাজনৈতিক গতিশীলতা বিহারের চিত্রকে আরও জটিল করেছে। উত্তর বা মিথিলা অঞ্চলে আরজেডি-কংগ্রেসের শক্তিশালী ঘাঁটি থাকলেও, এআইএমআইএম মুসলিম-প্রধান কেন্দ্রগুলিতে মহাগঠবন্ধনের জন্য চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। অন্যদিকে, মধ্য বিহার ছিল নীতিশ কুমারের জেডিইউ-এর দুর্গ, কিন্তু জন সুরাজ সেই কুর্মি এবং অন্যান্য ওবিসি ভোটারদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে জেডিইউ-এর ভিত্তিকে দুর্বল করে দিয়েছে। এতে আরজেডি সরাসরি লাভবান হতে পারে। দক্ষিণ বিহারে চিরাগ পাসওয়ানের

এলজেপি(আর) এবং জিতন রাম মাঝির এইচএএম দলিত ভোটে প্রভাবশালী হলেও, মুসলিম ভোট নিয়ে আরজেডি এবং এআইএমআইএম-এর মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা চলছে। আবার, সীমান্ত বিহারে এনডিএ সবচেয়ে দুর্বল অবস্থানে এবং এআইএমআইএম-এর কৌশল মূলত মহাগঠবন্ধনের মুসলিম-যাদব ভোটব্যাঙ্কে ফাটল ধরানো।

প্রার্থী তালিকায় বর্ণের বিন্যাস

বিহারের রাজনীতির 'প্রাণভোমরা' হলো জাতিগত সমীকরণ। কাস্ট সেন্সাসের পর দলগুলো তাদের কৌশল নতুন করে সাজিয়েছে, যা প্রার্থী তালিকায় স্পষ্ট। যেমন, বিজেপি তার প্রথম তালিকায় উচ্চবর্ণের (রাজপুত, ভূমিহার, ব্রাহ্মণ) ৩৩ জন প্রার্থী রেখেছে, অন্যদিকে ওবিসি-ইবিসি থেকে ৩১ জন। আরজেডি-র ৪০ জন প্রার্থী ওবিসি-ইবিসি থেকে, এবং মুসলিম-যাদবভিত্তিক রাজনীতিতে তাদের বিশ্বাস প্রতিফলিত হয়েছে। জেডিইউ কুর্মি ও ইবিসি-নির্ভর প্রার্থী দিয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ হলো, বিজেপি নেতা সম্রাট চৌধুরীর ৬৫ শতাংশ সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি সাধারণ ক্যাটেগরির ১৫.৫ শতাংশ ভোটারদের মধ্যে ভোট ভাগাভাগির জন্ম দিয়েছে। এই 'অ্যান্টি-জেনারেল' অভিযোগ জনসুরাজের জন্য সুযোগ তৈরি করেছে,যারা বিজেপিরঐতিহ্যবাহী উচ্চবর্ণেরভোটেথাবা বসাতে পারে। ৪০ শতাংশের বেশি ওবিসি-ইবিসি ভোটার এবারের নির্বাচনে নির্ধারক ভূমিকা নেবে।

কয়েকটি কেন্দ্রে এই সমীকরণ অত্যন্ত কঠিন লড়াইয়ের জন্ম দিয়েছে। যেমন, নালন্দায় জেডিইউ এবং জন সুরাজের লড়াই কুর্মি ভোটকে বিভক্ত করেছে। কাটিহারে মুসলিম ভোটের বিভাজনের ফলে এনডিএ অপ্রত্যাশিত সুবিধা পেতে পারে। অন্যদিকে, মধুবনীতে কংগ্রেস, বিজেপি এবং রাঘোপুরে আরজেডি-বিজেপির লড়াই জাতিগত মেরুকরণের স্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করছে।

গণতন্ত্রের দোটানা

বিহার ২০২৫ নির্বাচন কেবল ক্ষমতার হাতবদল নয়। এটি ভারতীয় গণতন্ত্রের জন্য একটি নির্ধারক মোড়। এসআইআর প্রক্রিয়ায় লক্ষ লক্ষ বৈধ ভোটারের নাম বাদ পড়ার অভিযোগ, জাতিগত সমীকরণের জটিল গণিত, এবং রাজনৈতিক দলগুলোর সূক্ষ্ম কৌশলী চাল;এই সব কিছুই প্রমাণ করে যে বিহারের ভোটার আজও সংখ্যা আর পরিচয়ের জালে আবদ্ধ। জন সুরাজের উত্থান, মহাগঠবন্ধনের ঐক্য এবং এনডিএ-র জোট কৌশল;প্রতিটিই ভোটের গতিপথ বদলাতে সক্ষম। তবে আসল প্রশ্ন এটাই-- এই লড়াই কি কেবল ক্ষমতা দখলের, নাকি সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন? বিহারের মাটির এই নির্বাচনী যুদ্ধ শুধু এই রাজ্যেরই নয়, সমগ্র ভারতের গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে। ভোটারদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত করবে;বিহার কি আবারও জাতিগত রাজনীতির জটিল সমীকরণে ফিরবে, নাকি উন্নয়ন ও ন্যায়ের নতুন পথের সন্ধান করবে? সেখানে জেন জি-র ভূমিকা সব হিসেব পাল্টে দিতে পারে। পিকে-র জন সুরাজ বর্ণ হিন্দুদের ভোট নয় জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সেই ভোটে থাবা বসালে বিহার বিধানসভা নির্বাচনে 'অপারেশন লোটাস' মুখ থুবড়ে পড়লে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। তবে শেষ কথা, রাজ্যটি হলো বিহার যেখানে জাতিগত সমীরকণের চিরাচরিত হিসেবের পথেই হাটবে, না বিহার নতুন পথের দিশা দেখাবে। এখন অপেক্ষা ১৬ নভেম্বর-এর ভোট গণনার দিনের জন্য। ❐

পরিযায়ী শ্রমিকদের জীবন-যন্ত্রণা

মজিবুর রহমান

২০২০ সালে কোভিড-১৯ অতিমারির পর থেকে পশ্চিমবঙ্গে পরিযায়ী শ্রমিকদের দুরবস্থা নিয়ে আলোচনা বৃদ্ধি পেয়েছে। ওই সময় থেকেই পাখির মতো শ্রমিক বোঝাতে 'পরিযায়ী' বিশেষণটির ব্যবহারও বেড়েছে। পরিযায়ী পাখিরা ঋতুভেদে কম করে দুটি অঞ্চলের মধ্যে যাতায়াত করে। অনুরূপভাবে, পরিযায়ী শ্রমিকরা কাজের সন্ধানে ভিন রাজ্যে অথবা ভিন দেশে চলে যান। কয়েক মাস বা বছর কাজ করার পর আবার পুরোনো ভিটামাটিতে ফিরে আসেন। অর্থাৎ, পাখি অথবা শ্রমিক কেউই বিলাসিতার বশবর্তী হয়ে স্থানান্তর করে না, তারা পরিযায়ী হয় জীবিকা নির্বাহের বাধ্যবাধকতা থেকে।

পরিযায়ী শ্রমিকরা হলেন অসংগঠিত ক্ষেত্রের নিম্ন আয়ের বেসরকারি কর্মী। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই পরিযায়ী শ্রমিক রয়েছে। বেকার সমস্যায় জর্জরিত ও বিশাল জনসংখ্যার দেশ ভারতে পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যাটা তুলনামূলকভাবে বেশি। তবে পরিযায়ী শ্রমিক সম্পর্কে কেন্দ্রীয় অথবা রাজ্য সরকারের কাছে কোনো হাল নাগাদ তথ্য নেই। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা ছিল ৯ কোটি ১৩ লক্ষ

আর এর মধ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ২৪ লক্ষ ৫ হাজার। ২০২৫ সালে এরাজ্যের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে আনুমানিক সাড়ে ১০ কোটি। কিন্তু রাজ্য সরকার দাবি করছে, জনসংখ্যা বাড়লেও পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা কমেছে। সরকার ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চালু হওয়া 'কর্মসাথী' প্রকল্পে নথিভুক্ত ২২ লক্ষ ৪০ হাজার সংখ্যাটিকেই পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা হিসেবে গণ্য করছে। উল্লেখ্য, কর্মসাথী প্রকল্পে ন্যূনতম অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ বেকার যুবক-যুবতীদের ২ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ দিয়ে ব্যবসা শুরু করার জন্য উৎসাহিত করা হয়। আগস্ট, ২০২৫ চালু হওয়া 'শ্রমশ্রী' প্রকল্পের আওতায় রাজ্যে ফিরে আসা পরিযায়ী শ্রমিকদের এক বছর পর্যন্ত প্রতি মাসে ৫ হাজার টাকা ভাতা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। তবে পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা নিয়ে রাজ্য সরকারের দাবির সঙ্গে অনেকেই সহমত পোষণ করেন না। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধির বদলে হ্রাস পাওয়া, কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে প্রচুর পড়ুয়া আসন ফাঁকা পড়ে থাকা এবং সংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মী নিয়োগ ভীষণভাবে অনিয়মিত হয়ে পড়ার পরিসংখ্যান থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, এরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা নিশ্চিতভাবেই অনেক বেড়েছে এবং সংখ্যাটা বর্তমানে ৪০ লক্ষের আশেপাশে হবে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিদেশে পাড়ি দেওয়া শ্রমিকের সংখ্যা দুই লাখের মতো। আবার এটাও ঘটনা যে, ভারতের বিভিন্ন রাজ্য সহ নেপাল, ভূটান প্রভৃতি পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে আগত পরিযায়ী বা অভিবাসী শ্রমিকের সংখ্যা আনুমানিক ৫০ লাখ।

সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া না গেলেও প্রায় নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গের সকল জেলার মধ্যে মুর্শিদাবাদের পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা সর্বাধিক। প্রায় ৯০ লাখ জনসংখ্যা ও ৭০ শতাংশ সংখ্যালঘুর জেলা মুর্শিদাবাদের পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা আনুমানিক পৌনে চার লাখ। একইভাবে ৫০ লাখ জনসংখ্যা ও ৫১ শতাংশ সংখ্যালঘুর মালদা জেলার পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা আনুমানিক পৌনে তিন লাখ। নদিয়া ও কোচবিহার জেলার পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা যথাক্রমে পৌনে দুই লাখ ও দেড় লাখ। পশ্চিমবঙ্গের পরিযায়ী শ্রমিকদের বেশিরভাগ নির্মাণ কর্মী বা রাজমিস্ত্রি হিসেবে কাজ করেন। এছাড়া অনেকেই প্লাম্বিং, ওয়েল্ডিং, আবর্জনা সংগ্রহ, জরির কাজ, কাঠের কাজ, কৃষি কাজ, খামার বাড়ি ও হোটেল-রেস্তোরাঁর কর্মী হিসেবে কাজ করেন। গোটা ভারতেই বাংলার শ্রমিকরা ছড়িয়ে থাকলেও তামিলনাড়ু, কর্নাটক, কেরালা, ওড়িশা, দিল্লি, মহারাষ্ট্র, বিহার ও ঝাড়খণ্ডে তাঁদের সংখ্যাটা বেশি। ভারতের বাইরে মূলত সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, কুয়েত, সুদান, ওমান, ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ায় বহু সংখ্যক বাঙালি শ্রমিক কাজ করেন।

পশ্চিমবঙ্গের শ্রমজীবীদের পরিযায়ী হওয়ার প্রধান কারণ হলো নিজ এলাকায় কাজের অভাব। এরাজ্যে নতুন কলকারখানা গড়ে উঠছে না। পুরনোগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের অবস্থা ভালো নয়। চাষাবাদ ভীষণভাবে অলাভজনক হয়ে পড়ায় অনেক জমি অনাবাদি থাকছে। ফলত খেতমজুররা কৃষিজমিতে কাজ না পেয়ে সাধারণ শ্রমিকে পরিণত হচ্ছেন। যাঁদের কোনো পুঁজি নেই অথবা শুধু কায়িক শ্রম প্রদান করেই উপার্জন করতে চান তাঁরা রাজ্যের মধ্যে নিয়মিতভাবে কাজ না পেয়ে বাড়িতে বৌ-বাচ্চাদের রেখে ভিন রাজ্যে বা দেশে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। তাঁদের পরিযায়ী বা অভিবাসী হওয়ার আরেকটি কারণ হলো পশ্চিমবঙ্গে শ্রমিকদের মজুরি তুলনামূলকভাবে অনেক কম। যেমন, রাজমিস্ত্রিরা এরাজ্যে যে মজুরি পান তার চেয়ে দেড়-দু'গুণ বেশি পান চেন্নাই-কেরালায়। এরাজ্যে একজন শ্রমিক মাসে ৫-১০ হাজার টাকা উপার্জন করতে হিমশিম খান কিন্তু ভিন রাজ্যে সহজেই ১৫-২০ হাজার টাকা উপার্জন করতে পারেন।

পরিযায়ী শ্রমিকদের অনেক অসুবিধা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে কাজ করতে হয়। পরস্পরের ভাষা না জানার কারণে পরিযায়ী শ্রমিকরা স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে ভালোভাবে মিশতে পারেন না এবং এজন্য কর্মস্থলে চলাফেরায় স্বচ্ছন্দবোধ করেন না। সবসময় একটা খোলসের মধ্যে আটকে থাকেন। অনেকেই শহরতলির বস্তিতে থাকেন যেখানে বিদ্যুৎ ও পানীয় জলের পরিষেবা পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায় না। অনেক সময় ঠিকাদাররা শ্রমিকদের প্রাপ্য মজুরি মিটিয়ে দিতে টালবাহানা করেন। এক্ষেত্রে উপযুক্ত মধ্যস্থতাকারীর অভাবে শ্রমিকদেরই আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। কর্মরত অবস্থায় কোনো শ্রমিকের মৃত্যু হলে মৃতের পরিবারের ক্ষতিপূরণ পাওয়ার ব্যাপারে সরকারি অথবা বেসরকারি কোনো সুনির্দিষ্ট বিধি নেই। এমনকি মৃতদেহ বাড়িতে নিয়ে আসার ব্যবস্থাও মৃতের পরিবারকে করতে হয়। অথচ নির্মীয়মান ভবন থেকে পড়ে গিয়ে অথবা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে প্রায়শই পরিযায়ী শ্রমিকরা মারা যান। ২০২০ সালে কোভিডের সময় অনাহারে, পথ ক্লান্তিতে ও পথ দুর্ঘটনায় পরিযায়ী শ্রমিকদের মৃত্যুমিছিল তাঁদের দুঃসহ জীবন সংগ্রামের দুঃখজনক দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের পরিযায়ী শ্রমিকরা মাঝেমধ্যেই ভিন রাজ্যে প্রশাসনিক হয়রানির শিকার হন। আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, প্যান কার্ড প্রভৃতি পরিচয়পত্র থাকা সত্ত্বেও তাঁদেরকে অকারণে পাকড়াও করে আটকে রাখা হয়। স্থানীয় দুষ্কৃতকারীরা বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের শারীরিকভাবে নিগ্রহ করে। ছোটখাটো অভিযোগে পিটিয়ে মারার ঘটনা ঘটে। অনেকেই রহস্যজনক ভাবে মারা যান। কিন্তু পরিযায়ী শ্রমিকরা কোনো আইনি সহায়তা পান না। তাঁদের ওপর অত্যাচারের ঘটনার গুরুত্ব সহকারে তদন্ত করা হয় না। দোষীরা কেউ ধরা পড়ে না, শাস্তিও পায় না। তবুও এরাজ্যের শ্রমিকরা ভিন রাজ্যে না গিয়ে পারেন না। অনেকেই মারধর খেয়ে তখনকার মতো বাড়ি ফিরে আসেন এবং পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে আবার কর্মস্থলে ফিরে যান। বিদেশে কাজ করতে যাওয়া বাঙালি শ্রমিকরা কখনও কখনও নিয়োগকারী এজেন্সির দ্বারা প্রতারিত হয়ে স্বদেশে ফিরে আসার ক্ষেত্রে কঠিন সমস্যায় পড়েন।

পশ্চিমবঙ্গের বাংলাভাষীদের 'অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশী' বলে দেগে দেওয়ার একটা বাজে ও বিভ্রান্তিকর প্রবণতা অবশিষ্ট ভারতীয়দের মধ্যে গড়ে উঠেছে। এর ফলে, বিভিন্ন রাজ্যে বহুবার বাংলাভাষীদের গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। আসামে এন আর সি'তে ১৯ লাখ বাঙালি পরিচয় সংকটে বিপন্ন হয়ে পড়েছেন। অতি সম্প্রতি কয়েকজন বাংলাভাষীকে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বাংলাদেশে 'পুশব্যাক' করেছে। আদালত সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে তাঁদেরকে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করতে। বাঙালির জাতিসত্তা নিয়ে প্রশ্ন তোলার পেছনে সাম্প্রদায়িক রাজনীতিরও একটা ব্যাপার রয়েছে। বাংলাভাষী আর বাংলাদেশীকে একাকার করে দেখার ভাষাগত অজ্ঞতা ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতির পরম্পরা পশ্চিমবঙ্গের পরিযায়ী শ্রমিকদের জীবন সংগ্রামকে আরও কঠিন করে তুলেছে।

পেটের দায়ে শ্রমিকদের যাতে পরিযায়ী হতে না হয় সেদিকে সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি দেওয়া দরকার। পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা কমাতে বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করার অবকাশ রয়েছে। প্রথমত, জেলার মধ্যে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগকে সরকারি সহায়তা প্রদান করতে হবে। দ্বিতীয়ত, জমি চাষাবাদকে লাভজনক করে গ্রামের মানুষকে কৃষিকাজের প্রতি আকৃষ্ট করতে হবে। পাঞ্জাব ও হরিয়ানা কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যে সাফল্য অর্জন করেছে সেখান থেকে পশ্চিমবঙ্গকে শিক্ষা নিতে হবে। তৃতীয়ত, শিক্ষা ব্যবস্থার হাল ফেরাতে হবে যাতে 'ড্রপআউট'-এর সংখ্যা কমে। স্কুলছুটের সংখ্যা কমলে পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যাও হ্রাস পাবে। চতুর্থত, স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীগুলোকে সক্রিয় করে তাদের কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি করতে হবে। পঞ্চমত, পরিযায়ী শ্রমিকদের নথিভুক্তকরণ ও আইনি সুরক্ষা প্রদানে সরকারকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ষষ্ঠত, কর্মরত অবস্থায় কোনো শ্রমিক আহত হলে তাঁর চিকিৎসার দায়িত্ব ঠিকাদারকে নিতে হবে। আর, মৃত্যু হলে মৃতদেহ বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া সহ মৃতের পরিবারকে সরকার ও ঠিকাদার উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে। সপ্তমত, পরিযায়ী শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার্থে সমাজকর্মীদের এন জি ও গঠন করতে হবে। অষ্টমত, রাজ্যের সার্বিক আর্থিক বিকাশ ঘটিয়ে শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি করতে হবে।

বৈষম্যমূলক শাসনব্যবস্থা সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সহানুভূতিশীল আচরণ করা থেকে বিরত থাকে। এরূপ মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হওয়া দরকার। মুর্শিদাবাদ ও মালদা সহ পশ্চিমবঙ্গের পরিযায়ী শ্রমিকদের জীবন যন্ত্রণা লাঘব করতে সরকারি ও বেসরকারি উভয় প্রকার উদ্যোগ গ্রহণ জরুরি। ❐

আর.এস.এস কে মহিমান্বিত করার অপচেষ্টা

শুভাশিস মজুমদার

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের শতবর্ষ উপলক্ষে একটি বিশেষ ডাকটিকিট এবং একটি স্মারক মুদ্রা প্রকাশের ফলে বিরোধী দলগুলি তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। কংগ্রেস এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে ইতিহাস বিকৃতি এবং সংবিধানকে অবমূল্যায়ন করার অভিযোগ তুলেছে।

কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ এক্স-এ একটি পোস্টে মোদীকে আরএসএস সম্পর্কে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মন্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। রমেশ ১৯৪৮ সালের ১৮ জুলাই ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীকে লেখা প্যাটেলের একটি চিঠির অংশ বিশেষ উল্লেখ করেছেন।

তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীকে লেখা একটি

চিঠিতে বলেছিলেন, "আরএসএস এবং হিন্দু মহাসভার ক্ষেত্রে, যেহেতু গান্ধিজীর হত্যার মামলাটি বিচারাধীন তাই আমি দুটি সংগঠনের অংশগ্রহণ সম্পর্কে কিছু বলতে চাই না, তবে আমাদের রিপোর্টগুলি নিশ্চিত করে যে, এই দুটি সংগঠনের, বিশেষ করে প্রথমটি (আরএসএস)-র কার্যকলাপের ফলে, দেশে এমন একটি পরিবেশ তৈরি হয়েছিল যেখানে এমন একটি ভয়াবহ ট্র্যাজেডি (গান্ধিজির হত্যাকান্ড) সম্ভব হয়েছিল.."

"আরএসএস-এর কার্যকলাপ সরকার এবং রাষ্ট্রের অস্তিত্বের জন্য স্পষ্টত বিপজ্জনক ছিল। আমাদের তথ্য প্রতিবেদনগুলি দেখায় যে নিষেধাজ্ঞা (ব্যান) সত্ত্বেও, সেই কার্যকলাপগুলি এখনও থামেনি। প্রকৃতপক্ষে, সময়ের সাথে সাথে, আরএসএস চক্রগুলি আরও বিদ্রোহী হয়ে উঠছে এবং ক্রমবর্ধমান পরিমাণে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত হচ্ছে..."

অন্য একটি পোস্টে রমেশ বলেন, ১৯ ডিসেম্বর, ১৯৪৮ সালে জয়পুরে এক বিশাল জনসভায় সর্দার প্যাটেল ভাষণ দিয়েছিলেন এবং আরএসএসের বিরুদ্ধে জোরালো বক্তব্য রেখেছিলেন। পরের দিন হিন্দুস্তান টাইমসে এই নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।

"আমাদের দৃঢ় সংকল্প যে আমরা আরএসএস বা অন্য কোনও সাম্প্রদায়িক সংগঠনকে দেশকে দাসত্ব বা ভাঙনের পথে ফিরিয়ে আনতে দেব না," জয়পুরের গান্ধীনগরে এক সমাবেশে ভাষণ দেওয়ার সময় প্যাটেল বলেন।

সিপিআই(এম) এটিকে সংবিধানের প্রতি "গুরুতর আঘাত এবং অপমান" বলে অভিহিত করেছে, যে সংবিধান আরএসএস কখনও মেনে নেয়নি।

আরএসএস কর্তৃক প্রচারিত 'ভারত মাতা'র ছবি সম্বলিত মুদ্রা এবং ১৯৬৩ সালের প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে ইউনিফর্ম পরিহিত আরএসএস স্বেচ্ছাসেবকদের ছবি সহ ডাকটিকিট প্রকাশের বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়েছে সিপিআই(এম) এবং বলেছে যে এটি মিথ্যা ইতিহাস। ভারত মাতার সিপিআই(এম) উল্লেখ করেছে যে তথ্য প্রমাণ দেখায় যে কুচকাওয়াজটি মূলত একটি বেসামরিক (অসরকারি) সমাবেশ ছিল এবং আরএসএসের অংশগ্রহণ, যদি হয়েও থাকে, তা বিচ্ছিন্ন এবং অপ্রকাশিত ঘটনা ছিল।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে সরকার আরএসএসের অতীতকে মহিমান্বিত করার চেষ্টা করছে। আদপে আরএসএস সংগঠনটি স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে দূরত্ব বজায় রেখেছিল এবং সমাজে ' ভাগ করো এবং শাসন করো' -বৃটিশদের এই কৌশলকে শক্তিশালী করেছে। কংগ্রেস এবং সিপিআই (এম), আরএসএস কে এক ঘোর সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় বিশ্বাসী দল হিসাবে চিহ্নিত করেছে। আরএসএসের বর্তমান ভূমিকাতেও দেখা যায়, সংখ্যালঘু ও প্রান্তিক সম্প্রদায়ের মানুষ লাগাতার তাদের আক্রমণের শিকার।

সিপিআই(এম) বলেছে যে প্রধানমন্ত্রীর পদক্ষেপ তাঁর সাংবিধানিক পদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করেছে। দলের সাধারণ সম্পাদক এম.এ. বেবি লিখেছেন যে আরএসএসকে মহিমান্বিত করে মুদ্রা এবং ডাকটিকিট প্রকাশ করা সংবিধানের অপমান এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে বিকৃত করার শামিল।

আরএসএস এর শতবর্ষ পালনের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী জাতি গঠনে আরএসএসের ভূমিকার প্রশংসা করেছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় এই সংগঠনের সমর্থন এবং নেতাদের আত্মত্যাগের কথা তুলে ধরেছেন। যা সম্পূর্ণ বিকৃত।

আরএস.এস এর কোনও নেতা কখনও স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়ে কারারুদ্ধ হননি। অথচ মোদী ও মোহন ভাগোবত বলে চলেছেন তারা নাকি ভয়ঙ্কর নির্যাতন সহ্য করেছেন। হাস্যকর।

মোদীর নেতৃত্বে ঘটা করে আরএসএস এর শতবর্ষ পালনের পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেস সহ আরো কয়েকটি বিরোধী দল তীব্র সমালোচনা করে উল্লেখ করেছে, রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘ কখনোই রাষ্ট্রীয় হিতে কাজ করেনা।

আজ পর্যন্ত কোনো দলিত, আদিবাসী, পশ্চাদপদ সম্প্রদায়ের মানুষ (যাঁরা ভারতের জনসংখ্যার প্রায় ৮০ শতাংশ), এমনকি কোনো মহিলা এই সংগঠনের প্রমুখ নির্বাচিত হন নি। এদের কার্যকলাপে দলিত আদিবাসী বিরোধিতা প্রকাশ পায়। এরা ভারতের সংবিধান বিরোধী মনুবাদী দল। ছুৎ অচ্ছুৎ - এ বিশ্বাসী। এই দল ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে কখনও অংশগ্রহণ করেনি, বরং ভারত ছাড়ো আন্দোলনের বিরোধীতা করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতীয় যুবাদের ব্রিটিশ সেনা বাহিনীতে ভর্তি হতে উৎসাহ দান করে। স্বাধীনতার পরে ৫২ বছর ধরে আরএসএস তাদের মুখ্য কার্যালয়ে ভারতের জাতীয় পতাকা (তিরঙ্গা) উত্তোলিত করেনি।❐

বিজ্ঞপ্তি

(১) স্বাধীনতা সংগ্রামে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের ভূমিকা ও

(২) জরুরি অবস্থার প্রেক্ষাপট ও দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার শক্তির অবস্থান

উপরোক্ত নিবন্ধ দুটি পুনরায় আগামী সংখ্যা থেকে প্রকাশিত হবে।

এক কদম গান্ধী কে সাথ পদযাত্রা

প্রেস রিলিজ , সর্ব সেবা সঙ্ঘ , লখনউ ঊ ১৯ অক্টোবর গত ২ অক্টোবর বেনারস রাজঘাট থেকে শুরু হয়েছে ' এক কদম গান্ধি কে সাথ' পদযাত্রা। পদযাত্রাটি আগামী ২৬ নভেম্বর দিল্লী রাজঘাটে পৌঁছবে।

দিবস ১৮

আজ পদযাত্রাটি সেনানী বিহার তেলিবাজার থেকে ক্যান্টনমেন্ট এলাকা হয়ে জয় নারায়ণ ডিগ্রি কলেজে এসে পৌঁছায়। সেখানে অধ্যক্ষ, শিক্ষক এবং ছাত্রছাত্রীরা তাঁদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান।

কলেজের অধ্যক্ষ বিনোদ চন্দ্র স্বাগত ভাষণ দেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন গান্ধীবাদী শিক্ষক অংশুমালী শর্মা, ছাত্রনেতা রোহিত কশ্যপ এবং মনোজ তিওয়ারি। সিটি কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন নগর সভাপতি শেহজাদ আলম, অমিত ত্যাগী, অ্যাডভোকেট আজহার, এবং কংগ্রেস ইন্টেলেকচুয়াল সেল (Congress Intellectual Cell)-এর পক্ষ থেকে ছিলেন সম্পূর্ণানন্দ মিশ্র, রাজেন্দ্র পান্ডে, শহিদ আলি সহ আরও অনেকে। ক্যাপ্টেন বংশীধর মিশ্রও পদযাত্রীদের স্বাগত জানান।

অভ্যর্থনার পর নন্দলাল মাস্টার এবং তাঁর দল 'এক হামারি, এক হ্যায় উনকি' ('একটি আমাদের, একটি তাঁদের') গানটি পরিবেশন করেন। পদযাত্রার উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে সর্ব সেবা সংঘের জাতীয় সভাপতি চন্দন পাল বলেন যে এই যাত্রার মূল বার্তা হলো সত্য, অহিংসা, সংবিধান এবং গণতন্ত্রের ওপর কথোপকথন স্থাপন করা।

অধ্যক্ষ বিনোদ চন্দ্র বলেন যে গান্ধী কেবল ভারতের নয়, সমগ্র বিশ্বের এক মহান মানব। মহারাষ্ট্রের লাতুর থেকে আসা সর্বোদয় সমাজের প্রাক্তন সভাপতি সোমনাথ রোড, মার্টিন লুথার কিং এবং বারাক ওবামার নাম উল্লেখ করে বলেন যে পৃথিবীতে বাস্তব পরিবর্তন কেবল গান্ধীবাদী পদ্ধতিতেই সম্ভব। মহারাষ্ট্র সর্বোদয় মণ্ডল সভাপতি রমেশ দানে, বিদ্যাধর মাস্টার, এনএপিএম (NAPM) নেত্রী রিচা সিং, এবং শ্যামধর তিওয়ারিও তাঁদের বক্তব্য পেশ করেন।

এরপর পদযাত্রাটি জয় নারায়ণ ডিগ্রি কলেজ থেকে বিধানসভা মার্গের দিকে অগ্রসর হয়ে হজরতগঞ্জের মহাত্মা গান্ধী পার্কে পৌঁছায়। সেখানে সকল পদযাত্রী গান্ধীজির মূর্তিতে মালা ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। এই উপলক্ষে পদযাত্রার আহ্বায়ক রামধীরজ বলেন, তআমরা গান্ধীজির ঐতিহ্যকে রক্ষা করতে বেরিয়েছি। এই সত্যাগ্রহ হলো সবরমতি আশ্রম, গুজরাট বিদ্যাপীঠ, এবং বেনারস রাজঘাটে সর্ব সেবা সংঘের জমিতে সরকারের দ্বারা জোরপূর্বক দখলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।দ তিনি আরও বলেন যে এই পদযাত্রার লক্ষ্য হলো সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রচার করা, সাংবিধানিক মূল্যবোধ রক্ষা করা, এবং যে কোনও মূল্যে গণতন্ত্রকে সুরক্ষিত রাখা।

গান্ধীজির মূর্তির সামনে বেনারসে নেওয়া শপথের কথা পুনর্ব্যক্ত করে সত্যাগ্রহীরা ঘোষণা করেন, 'আমরা আমাদের বাড়িতে বা হাসপাতালে মরব না; কিন্তু রাস্তায় বা জেলে লড়তে লড়তে মরব।'

পদযাত্রীরা এরপর সর্দার প্যাটেল এবং ডঃ ভীমরাও আম্বেদকরের মূর্তিতেও মালা অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান এবং গান্ধীজির আদর্শ অনুসারে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ও দলিতদের সম্মান প্রতিষ্ঠার জন্য একটি ব্যাপক অভিযান শুরু করার সংকল্প নেন।

অনুষ্ঠান চলাকালীন কুলদীপ সিং চৌহান ' হাম দেখ henge' ('আমরা দেখব') গানটি পরিবেশন করেন। লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য রূপরেখা বর্মা, প্রখ্যাত কবি ডঃ নরেশ সাক্সেনা, প্রাক্তন আইএএস (IAS) অফিসার হরিশচন্দ্র ও আনিস আনসারি, সমাজকর্মী ও সাংবাদিক রাজীব ধ্যানী, মিরাজ আলি খান, এবং গোন্ডার ব্রজেন্দ্র সিং উপস্থিত ছিলেন।

হজরতগঞ্জ থেকে এগিয়ে পদযাত্রাটি পরিবর্তন চকে পৌঁছায়, যেখানে সামাজিক পরিবর্তনের সমস্ত পথিকৃৎদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। পরবর্তীতে পদযাত্রীরা সুভাষ চন্দ্র বসুর মূর্তিতে মালা পরান এবং গান্ধী ভবনের দিকে অগ্রসর হন, যেখানে লাল বাহাদুর রায় তাঁদের স্বাগত জানান।

আজকের পদযাত্রায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন আলোক, অখিলেশ, রামপ্রকাশ, ঊষা, অন্নু, নেহা, পূজা, লক্ষ্মী, সালোনি, আর্যভট্ট মোহান্তি, অন্তর্যামী বরাল, সৌরভ, গৌরব, আনোখেলাল, জোখান যাদব, অরবিন্দ কুশওয়াহা, মানিকচাঁদ, অলিভা, সিস্টার সরিতা, সিস্টার ফ্লোরিন, অরবিন্দ অঞ্জুম (সর্ব সেবা সংঘের সাধারণ সম্পাদক), নিধি, শচীন, বিকাশ, বিবেক মিশ্র, লতা তাই রাজপুত, অজয়, রাহুল, প্রবীণ, এম.কে. সাহেব, এবং সুনিতা ওয়াঘমারে।

দিবস ১৮ এক কদম গান্ধী কে সাথ পদযাত্রা

বারাণসী রাজঘাট থেকে দিল্লি রাজঘাট পর্যন্ত লখনউ ১৯ অক্টোবর ২০২৫

আজ পদযাত্রাটি সেনানী বিহার তেলিবাজার থেকে ক্যান্টনমেন্ট এলাকা হয়ে জয় নারায়ণ ডিগ্রি কলেজে এসে পৌঁছায়। সেখানে অধ্যক্ষ, শিক্ষক এবং ছাত্রছাত্রীরা তাঁদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান।

কলেজের অধ্যক্ষ বিনোদ চন্দ্র স্বাগত ভাষণ দেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন গান্ধীবাদী শিক্ষক অংশুমালী শর্মা, ছাত্রনেতা রোহিত কশ্যপ এবং মনোজ তিওয়ারি। সিটি কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন নগর সভাপতি শেহজাদ আলম, অমিত ত্যাগী, অ্যাডভোকেট আজহার, এবং কংগ্রেস ইন্টেলেকচুয়াল সেল (Congress Intellectual Cell)-এর পক্ষ থেকে ছিলেন সম্পূর্ণানন্দ মিশ্র, রাজেন্দ্র পান্ডে, শহিদ আলি সহ আরও অনেকে। ক্যাপ্টেন বংশীধর মিশ্রও পদযাত্রীদের স্বাগত জানান।

অভ্যর্থনার পর নন্দলাল মাস্টার এবং তাঁর দল 'এক হামারি, এক হ্যায় উনকি' ('একটি আমাদের, একটি তাঁদের') গানটি পরিবেশন করেন। পদযাত্রার উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে সর্ব সেবা সংঘের জাতীয় সভাপতি চন্দন পাল বলেন যে এই যাত্রার মূল বার্তা হলো সত্য, অহিংসা, সংবিধান এবং গণতন্ত্রের ওপর কথোপকথন স্থাপন করা।

অধ্যক্ষ বিনোদ চন্দ্র বলেন যে গান্ধী কেবল ভারতের নয়, সমগ্র বিশ্বের এক মহান মানব। মহারাষ্ট্রের লাতুর থেকে আসা সর্বোদয় সমাজের প্রাক্তন সভাপতি সোমনাথ রোড, মার্টিন লুথার কিং এবং বারাক ওবামার নাম উল্লেখ করে বলেন যে পৃথিবীতে বাস্তব পরিবর্তন কেবল গান্ধীবাদী পদ্ধতিতেই সম্ভব। মহারাষ্ট্র সর্বোদয় মণ্ডল সভাপতি রমেশ দানে, বিদ্যাধর মাস্টার, এনএপিএম (NAPM) নেত্রী রিচা সিং, এবং শ্যামধর তিওয়ারিও তাঁদের বক্তব্য পেশ করেন।

এরপর পদযাত্রাটি জয় নারায়ণ ডিগ্রি কলেজ থেকে বিধানসভা মার্গের দিকে অগ্রসর হয়ে হজরতগঞ্জের মহাত্মা গান্ধী পার্কে পৌঁছায়। সেখানে সকল পদযাত্রী গান্ধীজির মূর্তিতে মালা ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। এই উপলক্ষে পদযাত্রার আহ্বায়ক রামধীরজ বলেন, 'আমরা গান্ধীজির ঐতিহ্যকে রক্ষা করতে বেরিয়েছি। এই সত্যাগ্রহ হলো সবরমতি আশ্রম, গুজরাট বিদ্যাপীঠ, এবং বেনারস রাজঘাটে সর্ব সেবা সংঘের জমিতে সরকারের দ্বারা জোরপূর্বক দখলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।' তিনি আরও বলেন যে এই পদযাত্রার লক্ষ্য হলো সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রচার করা, সাংবিধানিক মূল্যবোধ রক্ষা করা, এবং যে কোনও মূল্যে গণতন্ত্রকে সুরক্ষিত রাখা।

গান্ধীজির মূর্তির সামনে বেনারসে নেওয়া শপথের কথা পুনর্ব্যক্ত করে সত্যাগ্রহীরা ঘোষণা করেন, 'আমরা আমাদের বাড়িতে বা হাসপাতালে মরব না; কিন্তু রাস্তায় বা জেলে লড়তে লড়তে মরব।'

পদযাত্রীরা এরপর সর্দার প্যাটেল এবং ডঃ ভীমরাও আম্বেদকরের মূর্তিতেও মালা অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান এবং গান্ধীজির আদর্শ অনুসারে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ও দলিতদের সম্মান প্রতিষ্ঠার জন্য একটি ব্যাপক অভিযান শুরু করার সংকল্প নেন।

অনুষ্ঠান চলাকালীন কুলদীপ সিং চৌহান তহাম দেখhenge" ('আমরা দেখব') গানটি পরিবেশন করেন। লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য রূপরেখা বর্মা, প্রখ্যাত কবি ডঃ নরেশ সাক্সেনা, প্রাক্তন আইএএস (IAS) অফিসার হরিশচন্দ্র ও আনিস আনসারি, সমাজকর্মী ও সাংবাদিক রাজীব ধ্যানী, মিরাজ আলি খান, এবং গোন্ডার ব্রজেন্দ্র সিং উপস্থিত ছিলেন।

হজরতগঞ্জ থেকে এগিয়ে পদযাত্রাটি পরিবর্তন চকে পৌঁছায়, যেখানে সামাজিক পরিবর্তনের সমস্ত পথিকৃৎদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। পরবর্তীতে পদযাত্রীরা সুভাষ চন্দ্র বসুর মূর্তিতে মালা পরান এবং গান্ধী ভবনের দিকে অগ্রসর হন, যেখানে লাল বাহাদুর রায় তাঁদের স্বাগত জানান।

আজকের পদযাত্রায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন আলোক, অখিলেশ, রামপ্রকাশ, ঊষা, অন্নু, নেহা, পূজা, লক্ষ্মী, সালোনি, আর্যভট্ট মোহান্তি, অন্তর্যামী বরাল, সৌরভ, গৌরব, আনোখেলাল, জোখান যাদব, অরবিন্দ কুশওয়াহা, মানিকচাঁদ, অলিভা, সিস্টার সরিতা, সিস্টার ফ্লোরিন, অরবিন্দ অঞ্জুম (সর্ব সেবা সংঘের সাধারণ সম্পাদক), নিধি, শচীন, বিকাশ, বিবেক মিশ্র, লতা তাই রাজপুত, অজয়, রাহুল, প্রবীণ, এম.কে. সাহেব, এবং সুনিতা ওয়াঘমারে।

আজ পদযাত্রাটি সেনানী বিহার তেলিবাজার থেকে ক্যান্টনমেন্ট এলাকা হয়ে জয় নারায়ণ ডিগ্রি কলেজে এসে পৌঁছায়। সেখানে অধ্যক্ষ, শিক্ষক এবং ছাত্রছাত্রীরা তাঁদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান।

কলেজের অধ্যক্ষ বিনোদ চন্দ্র স্বাগত ভাষণ দেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন গান্ধীবাদী শিক্ষক অংশুমালী শর্মা, ছাত্রনেতা রোহিত কশ্যপ এবং মনোজ তিওয়ারি। সিটি কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন নগর সভাপতি শেহজাদ আলম, অমিত ত্যাগী, অ্যাডভোকেট আজহার, এবং কংগ্রেস ইন্টেলেকচুয়াল সেল (Congress Intellectual Cell)-এর পক্ষ থেকে সম্পূর্ণানন্দ মিশ্র, রাজেন্দ্র পান্ডে, শহিদ আলি সহ আরও অনেকে। ক্যাপ্টেন বংশীধর মিশ্রও পদযাত্রীদের স্বাগত জানান।

অভ্যর্থনার পর নন্দলাল মাস্টার এবং তাঁর দল "এক হামারি, এক হ্যায় উনকি" (অএকটি

আমাদের, একটি তাঁদের') গানটি পরিবেশন করেন। পদযাত্রার উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে সর্ব সেবা সংঘের জাতীয় সভাপতি চন্দন পাল বলেন যে এই যাত্রার মূল বার্তা হলো সত্য, অহিংসা, সংবিধান এবং গণতন্ত্রের ওপর কথোপকথন স্থাপন করা।

অধ্যক্ষ বিনোদ চন্দ্র বলেন যে গান্ধী কেবল ভারতের নয়, সমগ্র বিশ্বের এক মহান মানব। মহারাষ্ট্রের লাতুর থেকে আসা সর্বোদয় সমাজের প্রাক্তন সভাপতি সোমনাথ রোড, মার্টিন লুথার কিং এবং বারাক ওবামার নাম উল্লেখ করে বলেন যে পৃথিবীতে বাস্তব পরিবর্তন কেবল গান্ধীবাদী পদ্ধতিতেই সম্ভব। মহারাষ্ট্র সর্বোদয় মণ্ডল সভাপতি রমেশ দানে, বিদ্যাধর মাস্টার, এনএপিএম (NAPM) নেত্রী রিচা সিং, এবং শ্যামধর তিওয়ারিও তাঁদের বক্তব্য পেশ করেন।

এরপর পদযাত্রাটি জয় নারায়ণ ডিগ্রি কলেজ থেকে বিধানসভা মার্গের দিকে অগ্রসর হয়ে হজরতগঞ্জের মহাত্মা গান্ধী পার্কে পৌঁছায়। সেখানে সকল পদযাত্রী গান্ধীজির মূর্তিতে মালা ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। এই উপলক্ষে পদযাত্রার আহ্বায়ক রামধীরজ বলেন, 'আমরা গান্ধীজির ঐতিহ্যকে রক্ষা করতে বেরিয়েছি। এই সত্যাগ্রহ হলো সবরমতি আশ্রম, গুজরাট বিদ্যাপীঠ, এবং বেনারস রাজঘাটে সর্ব সেবা সংঘের জমিতে সরকারের দ্বারা জোরপূর্বক দখলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।' তিনি আরও বলেন যে এই পদযাত্রার লক্ষ্য হলো সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রচার করা, সাংবিধানিক মূল্যবোধ রক্ষা করা, এবং যে কোনও মূল্যে গণতন্ত্রকে সুরক্ষিত রাখা।

গান্ধীজির মূর্তির সামনে বেনারসে নেওয়া শপথের কথা পুনর্ব্যক্ত করে সত্যাগ্রহীরা ঘোষণা করেন, তআমরা আমাদের বাড়িতে বা হাসপাতালে মরব না; কিন্তু রাস্তায় বা জেলে লড়তে লড়তে মরব।দ

পদযাত্রীরা এরপর সর্দার প্যাটেল এবং ডঃ ভীমরাও আম্বেদকরের মূর্তিতেও মালা অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান এবং গান্ধীজির আদর্শ অনুসারে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ও দলিতদের সম্মান প্রতিষ্ঠার জন্য একটি ব্যাপক অভিযান শুরু করার সংকল্প নেন।

অনুষ্ঠান চলাকালীন কুলদীপ সিং চৌহান তহাম দেখেনগে (তআমরা দেখবদ) গানটি পরিবেশন করেন। লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য রূপরেখা বর্মা, প্রখ্যাত কবি ডঃ নরেশ সাক্সেনা, প্রাক্তন আইএএস (জ্জঙ() অফিসার হরিশচন্দ্র ও আনিস আনসারি, সমাজকর্মী ও সাংবাদিক রাজীব ধ্যানী, মিরাজ আলি খান, এবং গোন্ডার ব্রজেন্দ্র সিং উপস্থিত ছিলেন।

হজরতগঞ্জ থেকে এগিয়ে পদযাত্রাটি পরিবর্তন চকে পৌঁছায়, যেখানে সামাজিক পরিবর্তনের সমস্ত পথিকৃৎদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। পরবর্তীতে পদযাত্রীরা সুভাষ চন্দ্র বসুর মূর্তিতে মালা পরান এবং গান্ধী ভবনের দিকে অগ্রসর হন, যেখানে লাল বাহাদুর রায় তাঁদের স্বাগত জানান।

কাজল মুখার্জীর সংযোজন

আজ দশদিন ধরে ''এক কদম গান্ধীর সঙ্গে'' পদযাত্রায় আমরা হাঁটছি। বেনারস রাজঘাট থেকে ২রা অক্টোবর শুরু করে প্রায় দেড়শ কিলোমিটার পথ আমরা পেরিয়ে এসেছি। এখন ভগবতীপুরে এক আইন কলেজ চত্বরে আমরা দুপুরে খাওয়া সেরে একটু বিশ্রাম নিচ্ছি। বেনারস, এলাহাবাদ জেলা ছেড়ে আমরা ঢুকব প্রতাপগড় জেলায়। এরপর রায়বেরিলি, লক্ষ্ণৌ, উন্নাও, কানপুর, ঔরিয়া, ইটাওয়া, ফিরোজাবাদ, আগ্রা, মথুরা, ফরিদাবাদ, নিজামুদ্দিন হয়ে আমরা দিল্লির রাজঘাটে পৌঁছে যাব ২৬শে নভেম্বর। নিচু স্বরে প্রত্যেক গ্রাম-শহরে যেতে যেতে আমরা যেমন স্বৈরতন্ত্র আর বুলডোজার রাজের বিরুদ্ধে কথা বলছি, তেমনই শুনতে চাইছি প্রত্যেক এলাকায় সাধারণ মানুষের কথা। সারা দেশের মধ্যে আসাম, উত্তরপ্রদেশ হয়ে উঠেছে আজ একনায়কতন্ত্রের দুর্গ! আমাদের মধ্যে আসাম, ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা, রাজস্থান, বিহার, তামিলনাড়ু, কর্নাটক, কেরালা সমেত ১৯টা রাজ্যের মানুষ যোগ দিয়েছেন। সকলেই যে পুরো ১০০০ কিলোমিটার পথ হাঁটছেন তা নয়। আসাযাওয়া চলছে। কুড়ি-পঁচিশ থেকে আশি বছর বয়সি লোক এই যাত্রায় যোগ দিয়েছেন। শাহিনবাগ, দিল্লির কৃষক আন্দোলনের মতো যে কোনো মত-পথ-দলের লোক এই পদযাত্রায় আসতে পারে, আসছেও --- তবে কোনো দলীয় বা ধর্মীয় ঝান্ডা এবং দলের বা ধর্মের মত প্রচার চলবে না। আজ সকালেই একজন সাধুকে তাঁর কাঁধের ব্যাগে ''জয় শ্রী রাম'' লেখা থাকায় তা বদলাতে বলা হয়েছে। তিনি রাজি হয়েছেন, অন্য ব্যাগ নিয়েছেন। গান্ধীর সত্য, অহিংসা, সম্ভাবনার আদর্শ এবং গণতন্ত্র ও সংবিধান বাঁচানোর এই পদযাত্রায় কেন্দ্রীয় আওয়াজ।... আমি সুযোগ মতো আবার লিখে বন্ধুদের জানাব সব খবর। মাঝপথে যে কেউ এসে এতে যোগ দিতে পারে, অনেকেই দিচ্ছে। পদযাত্রার আয়োজক ক্ষ্মসর্ব সেবা সঙ্ঘক্ষ্ম। চার দিন হাঁটার পর ৬ই অক্টোবর সকালে মহারাষ্ট্রের গোরেগাঁও থেকে আগত ৭৩ বছর বয়সি শ্যামনারায়ণ মিশ্র ঘুমের মধ্যে মৃত্যুবরণ করেন। ওঁর দেহ ওঁর বড়ো ছেলে এসে নিয়ে যান এবং গোরেগাঁওতে নিয়ে গিয়ে অন্তিম সৎকার করেন। ❐

ভারতে সৎ বাঙালি ও দলিত বাঙালির মুক্তির একই পথ

নীতীশ বিশ্বাস

অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করে 'আপনি যে দলিত সাহিত্য করতেন, দলিত আন্দোলন করতেন, আম্বেদকর চর্চা করতেন, মতুয়া-সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করতেন ; আপনি কেন বাংলা ভাষা আন্দোলন করছেন ? এর উত্তরে আমি তাদের বলতে চাই বাঙালি তো এখন ভারতবর্ষের দলিত। সমগ্র বাঙালি দলিতত্ত্বে আচ্ছন্ন। তাদেরকে রক্ষা না করলে কেবলমাত্র শূদ্র-দলিতদের রক্ষা করা যাবে না ।

দ্বিতীয়তঃ আমি প্রথমে আঞ্চলিক ভাষা বা ডায়লেক্ট সংগ্রহ ও গবেষণার জন্যেই বাংলার বাইরে গমন করি । বিশেষ করে সারা ভারতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাওয়া বাঙালি উদ্বাস্তুদের আঞ্চলিক ভাষা । সেইসব অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষার মিশ্রণে এই বাংলা কিরূপ ধারণ করেছে--- এটাই ছিল আমার গবেষণার মূল বিষয় !

কিন্তু আমি যখন উত্তরপ্রদেশের নৈনিতাল জেলায়(বা উধম সিং নগরে) যাই , সেখানে দেখতে পাই বাংলাভাষার শেষ চিহ্নও মুছে যাচ্ছে । তাদের বাঙালিত্ব কেবল পূজো-শ্রাদ্ধ আর কিছু আঞ্চলিক আত্ম-কথনে বেঁচে আছে। কোনভাবেই বাংলা সাহিত্যের কোনও অস্তিত্ব নেই। বাংলা গান বলতে দুটো একটি ধর্মীয় সংগীত,কীর্তন আর লক্ষ্মীর পাঁচালি পর্যন্ত । অর্থাৎ বাঙালি শেষ হয়ে যাচ্ছে আর বাংলার ডায়লেট বা আঞ্চলিক ভাষা কিভাবে থাকে ? সে প্রবল হিন্দির জোয়ারে ভেসে যাচ্ছে।

তখন আমি আমার আত্মীয় বৃহত্তর অর্থে নমঃশূদ্র মতুয়া পৌণ্ডক্ষত্রিয় এবং দলিত উদ্বাস্তুদের ভাষা এবং ভাষিক গবেষণা ছেড়ে ' বাঙালির বৃহত্তর অস্তিত্বের বিষয় নিয়েই গবেষণা করা শুরু করি।' আমার সঙ্গে বিহার বাঙালি সমিতির অধ্যাপক গুরুচরণ সামন্তের আলাপ হওয়ার পর উনি আমার বাড়িতে আসেন বলেন বাঙালি সংগঠন করতে হবে। আমি তাঁকে শর্ত দিই যদি উদ্বাস্তুদের সমস্যা নিয়ে আপনারা আন্দোলন করেন তাহলে আমি আপনাদের সঙ্গে আছি। সেই মতো একমাত্র বিহার বাঙালি সমিতি উদ্বাস্তুদের নিয়ে কাজ করা শুরু করে।

আর দুঃখের সঙ্গে দেখতে পাই সারা ভারতে সব জায়গায় সেখানকার স্থানীয় দলিত সংগঠনগুলি বাঙালি দলিতদের পক্ষে নয়, বরঞ্চ বিপক্ষে। দেশে কোনও একটি কেন্দ্রীয় দলিত সংগঠন নেই যারা বাঙালির অধিকারের জন্য কথা বলে । এমন কি দলিতরানী মায়াবতী তো সরাসরি দলিত বাঙালি বিরোধী। তাদের সংরক্ষণ যা সামান্য কংগ্রেস আমলে ছিলো ও মূলায়েম সিং-এর আমলে আমাদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে প্রসারিত হতে যাচ্ছিল; তিনি মুখ্যমন্ত্রী হয়ে সরাসরি তার বিরোধিতা করেন; ফলশ্রুতি হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ থেকে ও ভারতের অন্য রাজ্য থেকে তার পার্টি প্রায় আজ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। তখনো একটি কেন্দ্রীয় দলিত সংগঠন ছিলনা যারা বাঙালির পক্ষে। । অন্তত ২০০৫ সালের আগে ছিলই না ।

বাঙালি দলিত আজ নীল আকাশে বিলীন হয়ে যাচ্ছে । বিজেপির হিন্দু-সুনামীর প্রবল উচ্ছ্বাসে বাঙালি অস্তিত্ব আজ নিশ্চিহ্ন। ।

সেজন্যই আমি বাংলা দলিত সাহিত্য ও দলিত মানুষের অধিকারের কথা উচ্চারণ করার জন্যে বৃহত্তর অর্থে বাঙালি সংগঠন করা শুরু করি। একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি কর্নাটকে মাত্র পাঁচটি গ্রামে দলিত বাঙালি আছে , তাদের পাঁচটি স্কুলে নিখিল ভারত সমন্বয় সমিতির প্রসেন রপ্তান ও সুবোধ বিশ্বাসের নেতৃত্বে আন্দোলন করে বাংলা দ্বিতীয় ভাষার মর্যাদা লাভ করে । কিন্তু এই দলিত বাঙালিদের যখন কাস্ট সার্টিফিকেট এর প্রশ্ন ওঠে তখন সেখানকার দলিত দলগুলি তথা দলিত গণসংগঠন গুলি তারা সকলেই বিরোধিতা করে। মহারাষ্ট্রে তো বুদ্ধিষ্ট-দলিতেরা বাঙালি দলিতদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে এমন কি মামলা করে, তাদের চাকরির অধিকার নষ্ট করে দিয়েছে।

মূল কথা হচ্ছে সারা ভারতের বাঙালিরা (দলিত ,অদলিত ,ব্রাহ্মণ ,শূদ্র হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খৃষ্টান) বৃহত্তর অর্থে আন্দোলন করতে না পারলে তার স্বার্থ রক্ষা হবেনা। যার সূচনা হয়েছে আমাদের কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা ক্যাপ্টেন ডি কে সিনহার নেতৃত্বে বিহারে।উত্তর পূর্ব ভারতে প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্যের লেখনী ও শারীরিক অংশগ্রহণে সেই আন্দোলন চলছে সাধ্য শক্তিতে । যে যৌথ আন্দোলন না করতে পারলে বৃটিশের 'ডিভাইড এন্ড রুল'-এর চক্রান্তে পা দিলে কিছুই হবেনা। এই মহান ও ঐতিহাসিক ঐক্য করতে না পারলে ভারতে বাঙালি দলিতের স্বার্থ রক্ষিত হবে না । আমি তাই বৃহত্তর অংশের কাজই শুরু করেছি । এটাই হচ্ছে বাংলা ভাষা আন্দোলনের নিহিত সত্য। যা গোটা বাঙালির ও তার ৮৫% বাঙালি দলিত সমাজের মুক্তির এক মহান সরনী। ❐

জনসাধারণের টাকায় বন্ধু আদানীদের কোম্পানিতে খয়রাতি মোদী সরকারের

অমিতাভ সিংহ

আদানীদের স্বার্থে মোদী সরকার দেশের সাধারণ মানুষের অর্থ কিভাবে অপব্যায় করছে তার একটা জ্বলন্ত উদাহরণ সম্প্রতি ফাঁস হয়ে গেছে। আদানীদের বিভিন্ন কোম্পানিতে এলআইসির ৩৩,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের ঘটনা বিশ্ববিখ্যাত নিউজ জার্নাল ওয়াশিংটন পোস্টের একটি প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছে । তাদের বক্তব্য অনুযায়ী ঋণে জর্জরিত আদানীর ব্যবসায়িক সাম্রাজ্য বাঁচাতে যখন বিদেশী ব্যাঙ্কগুলি তাদের ঋণ দিতে চাইছিল না তখন মোদী সরকার চুপি চুপি ৩.৯ বিলিয়ন ডলার বা ৩৩ হাজার কোটি টাকা আর্থিক পরিকল্পনা তৈরী করে ঋণভারাক্রান্ত আদানী গোষ্ঠীকে তহবিল সরবরাহ করল রাষ্ট্রায়ত্ত ও দেশের সর্ববৃহৎ এলআইসির মাধ্যমে। উক্ত প্রতিবেদনে দাবী করা হয় ২০২৫ সালের মে মাসে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক, তার অধীনস্থ ডিপার্টমেন্ট অব ফ্যাইনান্সিয়াল সার্ভিসেস, এলআইসি ও নীতি আয়োগ একসঙ্গে এই বিনিয়োগের রোড ম্যাপ তৈরী করে যার মধ্যে এলআইসি ৫৮৫ মিলিয়ন ডলারের বন্ড ইস্যুতে অর্থায়ন করে আদানী পোর্ট এর জন্য। এটা আদানী গোষ্ঠী ঘোষণা করে যাতে মানুষ আদানী গোষ্ঠীর প্রতি আস্থা রাখে ও বিনিয়োগকারীরা আকৃষ্ট হয়।

২০২৩ সালে মার্কিন সংস্থা হিন্ডেনবার্গ রিসার্চ আদানী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে শেয়ারমূল্য জালিয়াতি ও আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ করে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে হৈচৈ ফেলে দিয়েছিল। বিশ্বের তাবড় অর্থনীতিবিদেরা এই ঘটনাকে বিশ্বের সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক জালিয়াতি বলে রায় দিয়েছিলেন।

এর ফলে আদানীদের বিভিন্ন কোম্পানীর শেয়ারের দাম ভীষণভাবে পড়ে গিয়েছিল। সাধারণ বিনিয়োগকারীরা উক্ত গোষ্ঠীর ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন। তারপর ইউ এস সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেন্জ কমিশন আদানী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বহু বিলিয়ন ডলার ঘুষ ও জালিয়াতির মামলা দায়ের করে।আদানীরা জ্বালানী খাতের বরাত পেতে ২৫০ কোটি ডলার অবৈধভাবে লেনদেন ও মিথ্যা তথ্য প্রচার করেছে এই অভিযোগে। কারণ আমেরিকার আইন অনুযায়ী এটা বড় আর্থিক অপরাধ। তখন মাত্র চার ঘন্টার ট্রেডিং এ এলআইসির ৭৮৫০ কোটি ক্ষতি হয়েছিল।দিনটা ছিল ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৪। সেই দিনটাতেই মার্কিন আদালত গৌতম আদানী ও তার সাত সহযোগীর বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করে।এর ফলে গৌতম আদানী আমেরিকায় ঢুকলেই গ্রেপ্তার করা হবে বলে আশঙ্কা করা হয়। মোদীর নির্দেশে বিদেশমন্ত্রী জয়শংকর আমেরিকায় ট্রাম্পের সঙ্গে একটা সমঝোতা করতে গিয়েছিলেন বলে বিরোধীদের অভিযোগ। এই ঘটনার পর আদানী গোষ্ঠীর ভাবমূর্তি ধাক্কা খায় ও ঋণগ্রহণ ক্ষমতা কমে যায়।

কিন্তু খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যার সহায় তাকে রুধিবে কে! মোদী আসরে নেমে পড়লেন।সাধারণ ও নিম্ন আয়ের বিনিয়োগ আছে যে এলআইসিতে তারা এই বিশাল অংকের অর্থ রাজনৈতিক প্রভাবশালী বেসরকারি সংস্থা আদানী গোষ্ঠীর কোম্পানিতে বিনিয়োগ করে একটি বড় ঝুকি নিল।এখন এলআইসির যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে তাদের উদ্ধারের দায় নিতে হবে সরকারকেই। অর্থাৎ করদাতারা মোদীর সবচেয়ে শক্তিশালী বন্ধুকে টিকিয়ে রাখার জন্য আর্থিক ঝুঁকি বহন করতে বাধ্য হল সরকারের ইচ্ছায়।

ওয়াশিংটন পোস্টের প্রতিবেদনের উত্তরে আদানীরা বিবৃতি দিয়েছে যে মোদীর উত্থানের আগে থেকেই তাদের আর্থিক বৃদ্ধি ঘটেছে। একটু দেখে নেওয়া যাক উক্ত গোষ্ঠীর উত্থানের রেখাচিত্রটি।২০০০-০১ সালে তাদের মূল্য ছিল ৩৩০০ কোটি টাকার মত।২০১৩-১৪ সালে তা বেড়ে হল প্রায় ৪৭০৮০ কোটি টাকা।তখন মোদী গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী। মাত্র ১২/১৩ বছরে এই বিপুল পরিমাণ বৃদ্ধি কি প্রমাণ করে? মোদী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর তা বেড়েছে উল্কার গতিতে। বর্তমানে তা আট লক্ষ কোটির কাছাকাছি। এর মধ্যে কোভিদ অতিমারি সারা পৃথিবীকে টলিয়ে দিয়েছে। দেশের আর্থিক বৃদ্ধির হার নিম্নগামী হয়েছে। সব ধরণের ব্যাবসায়ীরা তাদের ব্যাবসায় প্রবল মার খেয়েছেন। কিন্তু মোদীর সন্তানতূল্য বন্ধু গৌতম আদানীর সম্পদ বেড়েছে চক্রবৃদ্ধি হারে। কি অসাধারণ পরিচালনা যা পৃথিবীর ইতিহাসে এক আন্তর্জাতিক রেকর্ড হয়ে চিরকাল থেকে যাবে। প্রধানমন্ত্রী মোদী যে দেশে গিয়েছেন তার সিংহভাগ দেশে তার সফরসঙ্গী হয়ে গিয়ে গৌতম আদানী সেই দেশে বাণিজ্যের বরাত

পেয়েছে। যদিও তাদের জালিয়াতকান্ড ফাঁস হওয়ার পর অনেক বরাত হয় বাতিল হয়েছে অথবা তা পুর্ণবিবেচিত হচ্ছে। কিন্তু মোদী যার সহায় তারে রুধিবে কে?

দেশের গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোগত সম্পত্তি যেমন সমুদ্রবন্দর, বিমানবন্দরগুলি বেসরকারিকরণ করা হল আদানীদের স্বার্থে। বিভিন্ন কোম্পানিকে ইডি,সিবিআই, আয়কর দপ্তর দিয়ে ভয় দেখিয়ে তাদের সম্পত্তি আদানী গোষ্ঠীকে বিক্রি করতে বাধ্য করা,আমদানিকৃত কয়লার দর বাড়িয়ে দেখানো সংক্রান্ত জালিয়াতি শেল কোম্পানির মানিলন্ডারিং নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে,যার ফলে আদানীদের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র কতৃক উৎপাদিত বিদ্যুৎ এর মূল্যবৃদ্ধি যার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত গুজরাটের গ্রাহকেরা। বিজেপি শাসিত রাজ্য মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও রাজস্থানে সরকারের সঙ্গে উচ্চমূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহের চুক্তি।বিহারে একরপ্রতি এক টাকা মূল্যে জমিচুক্তি। এইসবই ঘটেছে মোদী আমলে।

এলআইসির এই বিনিয়োগ আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছে ১৯৫৭ সালে ঘটা জওহরলাল নেহেরুর আমলের একটি ঘটনা। ওই বছর ১৬ ডিসেম্বরে সংসদে খোদ প্রধানমন্ত্রীর জামাতা ফিরোজ গান্ধি, যিনি রাহুল গান্ধির ঠাকুরদা, অভিযোগ করলেন হরিদাস মুন্দ্রার ডুবন্ত কোম্পানিতে এলআইসি এক কোটি পঁচিশ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করেছে। তিনি প্রমাণ করলেন যে অর্থমন্ত্রী টি টি কৃষ্ণমাচারীর বিশেষ অনুরোধে এলআইসি অর্থমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ হরিদাস মুন্দ্রার কোম্পানিতে বিনিয়োগ করেছে। বিতর্ক চলল দুই ঘন্টা ধরে। ব্রিটিশ শাসনে ছয় বছরেরও বেশী জেল খাটা এই স্বাধীনতা সংগ্রামী যুব সাংসদের অভিযোগের ফলে বিমলকৃষ্ণ দাসের নেতৃত্বে আভ্যন্তরীন তদন্ত কমিটি গঠিত হল। তাদের রিপোর্টে ফিরোজ গান্ধীর অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হল। প্রাক্তন বিচারপতি এম সি চাগলার নেতৃত্বে তদন্ত কমিটির রিপোর্টও একই কথা বলল, যে অর্থমন্ত্রকের চাপেই এই বিনিয়োগ। এলআইসির চেয়ারম্যানসহ মন্ত্রকের সংশ্লিষ্ট অফিসারদের শাস্তির সুপারিশ করা হল। আসলে সেইসময়ে বিচারপতিরা খোলামনে সরকারের বিরুদ্ধে রায় দিতে পারতেন, এখন বিজেপির আমলের মত তাদের ভয়ের পরিবেশে বা আর্থিক বা অন্য কিছুর প্রলোভনে পড়ে রায় দিতে হত না।

এর পরের ঘটনা এটাই কৃষ্ণমাচারী পদত্যাগ করলেন। এলআইসির চেয়ারম্যানও পদত্যাগ করলেন। হরিদাস মুন্দ্রার জেল হয়।

তবে এবারের ঘটনায় নির্মলা সীতারমনের বা এলআইসির চেয়ারম্যানসহ অন্য অফিসারদের কোন ভয় নেই। তাদের পদত্যাগ করতে কেউ বলবে না বরং মোদীর পুরষ্কারের তালিকায় তাদের নাম উঠে গেছে। ''মোদী হ্যায় তো মুমকিন হ্যায়'' এই স্লোগানটির এটাই সার্থকতা। ❐

Best wishes from -

INTEGRA VENTURES SERVICES Pvt. Ltd

BG-179, Sector-2, Salt lake
Kolkata-91